দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কর্মতৎপরতা

পি সুন্দরাইয়া

১৯৪২ সালে সমগ্র ইউরোপ দখল করার পর জার্মানির একনায়ক হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হয় যে নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশেই থাকবে। ব্রিটিশ সরকার এটাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে হিটলারের ঝটিকা অভিযান বন্ধ করার জন্য তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই মর্মে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্টদের দ্বারা বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়। কারণ তখনও পর্যন্ত এটা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হতো যে হিটলার যদি একবার রাশিয়া আক্রমণ করে তাহলে অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশরা তাকেই সমর্থন করবে, যাতে তিনি তার কমিউনিস্টবিরোধী জেহাদের যুক্তিসম্মত সমাপ্তি ঘটাতে পারেন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে গোটা ইউরোপের শহর ও নগরগুলিকে সিক্ত করার ফলে এই জার্মান নেতাটির বিরুদ্ধে অবশ্য ব্যাপক ঘৃণা তৈরি হয়েছিল। যুক্ত রাজ্যের ওপর তার অবিরাম বোমাবর্ষণ এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অল্পের জন্য হিটলার হেরে গেলেও ব্রিটিশদের কাছে তাকে একেবারে অপ্রিয় করে তুলে। এ অবস্থায় ব্রিটেনের শাসকশ্রেণিগুলির মধ্যেও আশঙ্কা দেখা দেয় যে জার্মানরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করে দিতে সফল হলেও শেষ পর্যন্ত সমগ্র যুক্তরাজ্যই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা ব্রিটিশ সরকারকে তার অবস্থান বদলে বাধ্য করেছিল তা হলো ১৯৩২ সাল থেকে খোদ ব্রিটেনসহ সারা বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্টদের ফ্যাসিবিরোধী শক্তিশালী আন্দোলন। ব্রিটিশ সমাজের সকল অংশই ইউরোপের কোথাও ফ্যাসিবাদের উত্থান বা ক্রমবৃদ্ধির বিরোধী ছিল এবং শাসকশ্রেণিগুলি কেবল তাদের বিপদের ঝুঁকি নিয়েই জনমতকে অগ্রাহ্য করতে পারতো।

হিটলার ছিলেন মানবতার শত্রু এবং ব্রিটিশ সমাজের কোন অংশই

তাদের সরকারকে ওর সমর্থনে দাঁড়াতে দিত না। এমনকি কৌশলগত বা মতাদর্শগত কারণেও নয়। আমরা অবশ্য সকলেই জানি যে ব্রিটিশরা বা আমেরিকানরা যারা যুদ্ধের শেষের দিকে হস্তক্ষেপ করেছিল তাদের কেহই আক্রমণকারী নাজিবাহিনীর অগ্রগতি রোধ করার জন্য আন্তরিক ছিল না। তারা চেয়েছিল জার্মানরা সোভিয়েতবাসীদের রক্ত ঝড়াক এবং যুদ্ধরত দেশগুলি সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়লেই কেবল তারা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেবার পরিকল্পনা এঁটেছিল। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান চলমান যুদ্ধ সম্পর্কে এক বক্তৃতায় এরকম কথাই বলেছিলেন। যাহাই ঘটে থাকুক না কেন ঐতিহাসিকভাবে এটা ছিল শুভ যে দু'টি দেশের কোনটিই সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাস্ত করার জন্য হিটলারের সঙ্গে হাত মেলায়নি। প্রচারের ক্ষেত্রে নাৎসি ও সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত রাশিয়া ও চীনকে মদত দেয়ার (সাময়িকভাবে না হলেও) যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত ছিল কার্যত: ফ্যাসিবাদের পশ্চাৎমুখী ও ঘৃণ্য মতাদর্শের বিরুদ্ধে সাম্যবাদের এক মনস্তাত্ত্বিক জয়।

স্পষ্টতই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে এই প্রশ্নই দেখা দেয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সামনে। কারণ ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে যখন ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয় তখন থেকে ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে জার্মানরা রাশিয়াকে আক্রমণ করা পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে কমিউনিস্টদের স্লোগান ছিল 'ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু'। এটাও এক সুবিদিত ঘটনা যে যুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে নাৎসি বাহিনীর হাতে নিজেরা আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি জার্মানদেরকেই সমর্থন করেছিল। তাই এই অবস্থায় কমিউনিস্টদের স্পষ্টই এই উপলব্ধি এলো যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আক্রমণসহ যুদ্ধকে আর চলতে দিলে তা সামগ্রিকভাবে সমগ্র মানব জাতির জন্য ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনবে। সেজন্যই যুদ্ধের অবসানকল্পে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানো প্রয়োজন। তবে হিটলারের সেনাবাহিনী যেসব দেশ আক্রমণ ও ধ্বংস করেছিল তারা কিন্তু কোন শান্তিপূর্ণ মতৈক্যে পৌঁছুতে প্রস্তুত ছিল না।

ফলশ্রুতিতে রাশিয়া একটি মীমাংসায় আসতে মনস্থির করে, যাতে জার্মানির সংযুক্তিকরণ বা বিরাট ক্ষতিপূরণের কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল না। শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাশিয়া যুদ্ধের নিষ্পত্তি ঘটায়। যুদ্ধের এই ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তি বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও বিকাশে সাহায্য করবে কিনা তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা বিতর্ক চলে, সর্বত্র পরস্পরবিরোধী অভিমত উঠে আসে। এই আপাত পরস্পরবিরোধী অবস্থানের প্রধান কারণ ছিল এই যে ইউরোপের এক বিরাট অংশ দখল করে নেয়ার পর হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে তার এক বিরাট ভূখণ্ডকে জার্মানির সঙ্গে সংযুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। স্বাভাবিক কারণেই শান্তির বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে তিনি এর কমে কোন নিষ্পত্তিতে পৌঁছুতে পারেন না। যেসব সাম্রাজ্যবাদী দেশকে নাৎসিদের ক্রোধের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তারা ফাঁদে আটকে পড়া জার্মানিকে শান্তির বিনিময়ে ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। বরং বড় রকমের প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির প্রশ্নে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও দ্বিধাবিভক্ত ছিল। যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় হিটলারকে সমর্থন করার জন্য এবং নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়ার পাশে দাঁড়াতে অস্বীকার করায় তারা যদিও নিজ নিজ দেশের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিল, তাদের নিজেদের দেশের উপরই কিন্তু জার্মান বিমান বাহিনীর জঙ্গী জেট বিমানগুলি মারাত্মকভাবে বোমা বর্ষণ করেছিল। যে জনগণ জার্মান বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়েছিল, লুটপাট করে নেয়া হয়েছিল যাদের সর্বস্ব এবং যাদের নিরাপত্তা হয়ে উঠেছিল বিপন্ন তাদের কাছে শান্তি প্রক্রিয়াকে পৌঁছে দেয়া কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পক্ষে একেবারেই সম্ভবপর ছিল না। সেজন্যই তারা যে কোন ধরনের ন্যায়সঙ্গত বা শান্তিপূর্ণ মতৈক্যের বিরোধী ছিল।

যুদ্ধ সম্পর্কিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভারতে আমরা কমিউনিস্ট পার্টির পত্রপত্রিকার প্রবন্ধের মাধ্যমে ১৯৩৮ সালের সোভিয়েত- জার্মান-অনাক্রমণ চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। এটা অবশ্য স্বতন্ত্র বিষয় যে জার্মানরা পরবর্তী সময়ে রাশিয়াকে আক্রমণ করেছিল। যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাসহ আমরা প্রচার

করি যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি ইউরোপে নাৎসি ও ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতি আক্রমণে শামিল হতে রাশিয়ার আহ্বানে কর্ণপাত না করায় এই চুক্তি তখন সময়ের চাহিদা ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পোল্যান্ড থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ করতে জার্মানিকে প্ররোচিত করে আসছিল, রাশিয়ানদের সঙ্গে কোন কৌশলগত অংশীদারি চুক্তিতে আসতে পোল্যান্ড অস্বীকার করছিল, যদি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে তাহলে নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘর্ষের জন্য নিজের সেনাবাহিনী ও কৌশলগত মজুত বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করে তোলার জন্য রাশিয়ার প্রয়োজন ছিল কিছু সময়ের।

সাধারণভাবে যুদ্ধ সম্পর্কে এবং বিশেষত হিটলারের জার্মানি সম্পর্কে রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। রাশিয়ার অবস্থানের প্রতি আমাদের সমর্থন সম্পর্কে আমরা খুবই স্বচ্ছ ও ঐক্যবদ্ধ ছিলাম। পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার ওপর জার্মানির আক্রমণের ফলশ্রুতিতে রাশিয়ার সেনাবাহিনী ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট অভিমুখে অভিযান শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস করা। পূর্বে এই ফ্রন্টটি পোলিশ সেনাবাহিনীর অধীন ছিল। হিটলারের নজর ছিল এমন তিনটি স্বাধীন বাল্টিক রাষ্ট্রের ওপর যেগুলি রাশিয়া অধিগ্রহণ করে। রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধলে এই রাষ্ট্রগুলি রণকৌশলগত দিক থেকে জার্মানির কাছে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু আগেই অভিযান চালিয়ে সোভিয়েত তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়। যুদ্ধের কয়েক বছর পর ঐ তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র নিজ নিজ প্রাদেশিক সরকারগুলির সম্মতিক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিশে যায়। অনুরূপভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ফিনিশ প্রতিরোধ রেখা গুঁড়িয়ে দিয়ে লেনিনগ্রাড রক্ষার উদ্দেশ্যে ফিনল্যান্ডের অধিকার নিজের হাতে তুলে নেয়, তখন আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে দাঁড়াই। পারস্পরিক আক্রমণ চুক্তিতে সই করতে অস্বীকার করায় অথবা জার্মান বাহিনীকে রাশিয়া অভিযানে বাধা দিতে নিশ্চয়তা প্রদানে অস্বীকার করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এই পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ফিনল্যান্ড চুক্তিতে সই করতে বাধ্য হয়। সোভিয়েতের ঐ সকল পদক্ষেপে

রণকৌশলগত দিক থেকে সঠিক বলে প্রমাণিত হয় যখন জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে। লেনিনগ্রাডকে রক্ষায় সোভিয়েতসমূহ অধিকতর শক্তিশালী অবস্থানে ছিল।

তবে ভারতীয় পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামের প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আমাদের কি দৃষ্টিভঙ্গি হবে তা নিয়ে পার্টির অভ্যন্তরে বিতর্ক ছিল, বিশেষত যখন ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধে পার্টি ইতোমধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থনের অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে। ১৯৩৯ সালের শুরু থেকে ১৯৪১ সালের শেষ অবধি ভারত ছেড়ে যেতে ব্রিটিশকে বাধ্য করার জন্য জাতীয় আন্দোলন তীব্র করতে আমরা কংগ্রেসের কাছে দাবি জানিয়ে আসছিলাম। ইতোমধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের ভারেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছিল। কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমরা খুবই সমালোচনামুখর ছিলাম। আমরা বলেছিলাম—"কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত সত্যাগ্রহ ও অহিংস সংগ্রাম নিছক প্রতিকী পদক্ষেপ যা কোনোভাবেই দেশের স্বাধীনতা আনবে না। তারা শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোসে পৌঁছাতে চায় এবং নামমাত্র সুবিধা প্রাপ্তির পর যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে সাহায্য করতে চায়।"

তাই যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী জমানাকে ছুঁড়ে ফেলার জন্য আমরা জঙ্গী আন্দোলনের পক্ষে সওয়াল করেছিলাম। অবশ্য যুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে হিটলারের মোকাবিলায় তার ক্ষমতায় যতটুকু করা সম্ভব তা তারা করবে এবং মিত্র শক্তিগুলির হাতে জার্মানির পরাজয় সুনিশ্চিত করবে। এই ঘোষণার পরক্ষণেই আমাদের মধ্যে দু'টি অভিমত গড়ে উঠে— সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সাহায্য নিয়ে আমরা ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধ চালিয়ে যাবো কিনা, নাকি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর যে দাবি আমরা শুরু থেকেই জানিয়ে আসছিলাম সেই অনুযায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো। কমিউনিস্টরা অবশ্য দেশের মধ্যে ছিল এক ক্ষুদ্র শক্তি। কিন্তু বামপন্থীদের দরদীর সংখ্যা ছিল বেশ ভারী। আর কংগ্রেস ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন জাতীয় আন্দোলনে ওরা ছিলেন

সমান অংশীদার। "দেশের সমস্ত বাম মনোভাবাপন্ন শক্তিকে সমবেত করে আমরা যদি সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালাতাম তাহলে তা নাৎসিদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লড়াইকে দুর্বল করে দিত।" ঐ প্রশ্নটি পার্টির অভ্যন্তরে সর্বস্তরে এবং পার্টির বাইরেও আন্তরিকভাবে আলোচিত হয়েছিল।

আমার স্পষ্টই স্মরণে আছে যে আমাদের পার্টির অবস্থান সম্পর্কে মাদ্রাজ থেকে আমরা গোপনে যে পত্রিকা প্রকাশ করতাম তাতে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে আমি লিখেছিলাম—" আমরা চাই সোভিয়েত ইউনিয়ন জয়লাভ করুক এবং হিটলার পরাজিত হোক। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতি সমর্থনের অঙ্গীকার ঘোষণা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘোষণাকে আমাদের 'আন্তরিক' বলে বিশ্বাস করার এবং পুরো দাম দেয়ার প্রয়োজন নেই। বস্তুতপক্ষে জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করতে ওরা স্থলযুদ্ধে সোভিয়েতের সমর্থনে ওদের সৈন্যবাহিনীকে সমাবেশ না করতেও পারে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি রাশিয়ার রক্ত ঝরাতে জার্মানিকে অনুমতি দিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং ব্রিটিশের সমর্থনে প্রকাশ্য ঘোষণা সম্পর্কে আমাদের কোনো মোহ থাকা ঠিক হবে না। তাদের ঘোষণা যে নিরস তা আমাদের অবশ্যই পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বাধ্য করার সর্বোত্তম পথ হলো আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তীব্র করা, তা অর্জন করা এবং তারপর রাশিয়ার সমর্থনে আমাদের জনগণ এবং সহায় সম্বলকে সমবেত করা।" বোম্বাইয়ে আমাদের পার্টি কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত জার্নালে এই প্রবন্ধটি ইংরাজিতেও ছাপা হয়েছিল। ইতোমধ্যে, ভারতের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র করার প্রশ্নে পার্টিতে বিরাট বিতর্ক তৈরি হয়। তেমন কোনরকম প্রতিরোধ ছাড়া হিটলারের সেনাবাহিনীগুলি অগ্রসর হতে থাকায় কমরেডদের সাধারণ অনুভূতি ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সত্যিসত্যিই বিপদগ্রস্ত। রণাঙ্গনে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও ঘটনাবলী সম্পর্কে সকল পার্টি সদস্য ও বামপন্থী দরদীদের মধ্যে উদ্বেগের সঞ্চার হয়। তারা চাইছিলেন সোভিয়েত যুদ্ধে জয়লাভ করুক, কিন্তু যদি রাশিয়াকে পরাজয় স্বীকার করতে

হয় তাহলে বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিণতি কি হবে তা নিয়ে তারা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং আমরা এই বুঝাপড়ায় উপনীত হই যে ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধে পুরো মনঃসংযোগের উদ্যোগ থেকে ব্রিটিশ সরকারকে সরিয়ে না এনে তাকে দম নেয়ার কিছুটা সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন এবং আমাদের এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ সরকারের ভারত থেকে সম্পদ ও জনশক্তি সংগ্রহের উদ্যোগ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন প্রশ্ন দেখা দেয় আমরা কীভাবে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করবো যখন ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পরামর্শে কর্ণপাত করছে না? জাতীয় আন্দোলনের তরফে যেসব সাধারণ দাবিদাওয়া তুলে ধরা হয়েছিল সরকার তো সেগুলিও মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের পরও আমাদেরকে আরেকটি বিশেষ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। জাতীয় আন্দোলনের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বৃহদংশের সুদৃঢ় অভিমত ছিল এই যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে হাতুড়ির আঘাত হানার এটাই উপযুক্ত সময়। যুদ্ধের কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এইসময়ে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন তীব্র করা হলে তারা দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হবে। একইসঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের কোন অংশই সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে জয়যুক্ত না হোক তা চাননি, চাননি যে জার্মানি রাশিয়ার উপর প্রভুত্ব করুক। ফ্যাসিবাদের বৃহত্তর বিপদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশ্নে সকলেই ছিলেন ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু একটি অংশের অভিমত ছিল জাতীয় আন্দোলনকে জোরদার করে ব্রিটিশদের এদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য করার এটাই উপযুক্ত সময়। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাগ্যে কী ঘটবে এ নিয়ে ঐ অংশটির কোন মাথাব্যথা ছিল না। নেহরু, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপন্থীদের কিছু অংশ এবং কমিউনিস্টরা—এরা সকলেই চাইতেন রাশিয়া জার্মানিকে পরাজিত করুক। যখন এই গোটা বিষয়টা নিয়ে দেশজুড়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছিল তখন সি পি আই-র সকল উচ্চ নেতৃত্বকে রাজস্থানের দেউলির ডিটেনশন ক্যাম্পে অন্তরীণ করা হয়। বাইরের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ ছিল না। আটক রাখা নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বি টি রণদিভে,

ডাঙ্গে এবং তৃতীয় জন ছিলেন ভরদ্বাজ বা ঘাটে। ভরদ্বাজ ছিলেন মূলত: উত্তরপ্রদেশের, কিন্তু গ্রেপ্তার হওয়ার আগে তিনি আমেদাবাদে বি ভি সি আই রেলওয়ে ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে কাজ করছিলেন। তাঁরা একটি দলিল, বলা ভালো, একটি থিসিস বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার কথা তাতে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছিল। তাতে তারা ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের যুদ্ধের প্রতিটি প্রস্তুতিতে সমর্থন করার জন্য কমিউনিস্টদের আহ্বান জানিয়ে পার্টি লাইন সুস্পষ্টভাবে বদলের জন্য সওয়াল করেন। ইতোমধ্যে বোম্বাইতে আমাদের গোপন ব্যবস্থা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আমাদের অবস্থান চূড়ান্ত করে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে পলিটব্যুরো সেখানে মিলিত হয়। অধিকারী, পি সি যোশী এবং আমিসহ আরও কয়েকজন মিটিং-এ উপস্থিত ছিলাম। যুদ্ধ শুরুর আগে শীর্ষ নেতৃত্বের অধিকাংশকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, দক্ষিণ ভারতে আন্দোলনের প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে উপস্থিত সদস্যদের ভোটে পলিটব্যুরোতে নির্বাচিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতি নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করি, যদিও এখানে নিজের অবদানকে আমি তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি না। কিন্তু আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু স্মরণ করতে চাই। অধিকারী ও অন্যান্যদের অভিমত ছিল যে ব্রিটিশ সরকারের সমর্থনে আমাদের প্রকাশ্যে কিছু বলা ঠিক হবে না। আমাদের উচিত হবে সমর্থনের পূর্বশর্ত হিসেবে স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরা। কমরেড পি সি যোশী ছিলেন সম্পাদক এবং বোম্বাইতে পার্টির গোপন ব্যবস্থা গড়ে তোলার পুরো কৃতিত্বটা তাঁরই প্রাপ্য। পুরো বেআইনি ঘোষিত সময়কালে দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ কমরেডদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পার্টির মুখপত্র (National Front) এর প্রকাশনা এবং বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গণসংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমার মতে ১৯৩৫ থেকে ১৯৪২ বা ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত পার্টির বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসেবে তিনি বিরাট অবদান রেখেছেন। পার্টি ক্যাডারও জনগণের

কাছে পার্টি লাইনকে যথোপযুক্ত করে উপস্থাপন করাই ছিল পলিটব্যুরো মিটিং-এ তাঁর আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। মিটিং-এ অন্যান্যদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে তিনি বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করার জন্য আমাদের পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব তা সবই করা উচিত। স্পষ্ট বোঝাপড়া গড়ে উঠে যে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয় ঘটলে আমাদের স্বাধীনতাও সুদূরের স্বপ্নই থেকে যাবে। যাই হোক, যুদ্ধে ব্রিটিশদের প্রতি সমর্থন আমাদের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে সে সম্পর্কে জনগণের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করাই হয়ে উঠে আমাদের আলোচনার সমগ্র বিষয়বস্তু। সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থরক্ষা করার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, একমাত্র ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের সমর্থনের বিষয়টা জনগণের সামনে উপস্থিত করা প্রয়োজন। এটাই ছিল যোশীর যুক্তি এবং পার্টির মূল বোঝাপড়া। আমার মনে আছে বোম্বাইতে আমাদের এক গোপন আস্তানায় টানা তিন সপ্তাহ ধরে দিন রাত আলোচনা হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত যোশী সমগ্র পার্টির জন্য এক অনুপম পার্টি লাইন উপস্থাপনে সফল হন। প্রকাশ্য ঘোষণা হয় যে: "এই (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) হলো জনগণের যুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদ এই যুদ্ধে কয়েদীতে পরিণত। এই যুদ্ধে বিজয় ব্রিটিশদের বিজয় হিসেবে বিবেচিত হবে না। বিবেচিত হবে জনগণের বিজয়োৎসব হিসেবে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যখন চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে সোভিয়েত ইউনিয়নই সারা বিশ্বে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি হয়ে উঠবে। ব্রিটিশ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ সাময়িক মিত্র হলেও স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পরে জনগণের অগ্রগতি রোধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।"

আমার স্পষ্ট মনে আছে যে ঐ দলিলের শিরোনাম ছিল From People's War to the Freedom Front (জনগণের যুদ্ধ থেকে স্বাধীনতার রণক্ষেত্রে)। পার্টির লাইন, অথবা বলা ভালো, যোশীর সূত্রায়ন দেশের বামপন্থীদের দ্বারা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের কমরেড চন্দ্রম

এবং অন্যান্যরাও পার্টির লাইনকে সমর্থন করেছিলেন। সাধারণভাবে সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর আমাদের মতাদর্শগত ধারণা সম্পর্কে কোনও রকম বিরোধিতা ছিল না। কিন্তু বাটলীওয়ালার মতো কিছু জাতীয়তাবাদী কমরেড ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রস্তুতিতে আমাদের পার্টির সমর্থনের ধারণাকে পছন্দ করেননি। অজয় দেউলি ডকুমেন্টকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন যেহেতু স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতীয় আন্দোলনকে তীব্র করার কাজে আমরা দীর্ঘদিন ধরে মনোনিবেশ করে আসছিলাম। জাতীয় আন্দোলনের জন্য বড় ধরনের সুবিধা আদায় না করে তাঁরা চাননি যে পার্টি যুদ্ধে ব্রিটিশকে সমর্থন করুক।

যাই হোক, ১৯৪১ সালে ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যায় যখন লেনিনগ্রাডের প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর জার্মান বাহিনী মস্কো দখলের রণকৌশলের শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। মস্কো দখলের জন্য হিটলার যখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন ঠিক তখনই জাপানের জঙ্গী জেট বিমানগুলি পার্ল হারবারে বোমাবর্ষণ করে। যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার জন্য এটা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রণোদিত করার প্রয়াস। ততদিনে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জাপানের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বড় ধরনের সুবিধা ঘোষণার জন্য ব্রিটিশ সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ তৈরি হয়। একই সময়ে ভারত থেকে যা কিছু সম্পদ ও জনশক্তি যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য সংগ্রহ করা সম্ভব তা প্রকৃত কোন রাজনৈতিক স্বাধীনতা না দিয়ে তারা ঝেঁটিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তারা একটি অন্তবর্তীকালীন জাতীয়তাবাদী সরকার গঠনে প্রস্তুত ছিল যদি ব্রিটিশদের যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য কংগ্রেস ভারতীয় জনগণের পূর্ব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কংগ্রেস তা মোটেই সন্তোষজনক নয় বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

কংগ্রেস ও সাম্রাজ্যবাদী সরকারের মধ্যে আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার পর কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্ররোচনা যোগাতে থাকে। গান্ধী 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' রণধ্বনি দিয়ে সংগ্রামের আহ্বান জানান। অন্যদিকে

নেহরু এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এ ধরনের রূঢ় প্রত্যুত্তরের পক্ষপাতি ছিলেন না। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সমর্থনের মাধ্যমে বিশ্ব শান্তির অন্তরায় ফ্যাসিবাদের বিপদ শেষ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের কোন সংশয় ছিল না। আর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সমর্থনের অর্থ ছিল ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রতিও সমর্থন। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি বড় ধরনের সুবিধা আদায় করা ছিল একমাত্র যুক্তি এবং কংগ্রেস তার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্ত মেনে চলেছিল। তারা সংগ্রাম তীব্র করে তোলার সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী সরকারও দমনপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। রাস্তা অবরোধ, ট্রেন পরিষেবার বিঘ্ন সৃষ্টি, সরকারি কাজে বাধাদানের মতো অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে ইন্ধন যোগানোর দায়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৪২ সালে কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ইতোমধ্যে ব্রিটিশদের যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে পার্টি লাইন পরিবর্তন করায় আমাদের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ফলে আমরা বোম্বাইতে আইনসম্মতভাবে আমাদের পার্টি কেন্দ্রের কাজ শুরু করি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪১ সালের জুন মাসে রাশিয়ার ওপর জার্মান বাহিনীর আক্রমণের অনেক আগেই আমরা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর আমাদের দলিল প্রকাশ করি। আমার মনে হয় ১৯৪০ সালের শেষ নাগাদ দলিলটি প্রকাশ করি। সুতরাং আমরা যখন প্রকাশ্যে কাজ শুরু করি আমরা কংগ্রস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রচার করতে থাকি, যাতে দেশের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশ সরকারের সামনে আমাদের ঐক্যবদ্ধ রূপ তুলে ধরতে পারি।

যে সকল লোক যারা পঞ্চম বাহিনীর নামে ভারতে ব্রিটিশবিরোধী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চালাচ্ছিল তারা যা করেছিল তা হটকারী ও বোকামির চেয়ে কম ছিল না। কংগ্রেসের কোনও কোনও শীর্ষনেতাও ঐ বন্ধ্যা ও হিংসাত্মক অভিযানে জড়িত ছিলেন। আমরা অবশ্য এই ইস্যুটিকে কঠোরভাবে গ্রহণ করিনি, কিন্তু পঞ্চম বাহিনীর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল প্রকাশ্যভাবে তাদের নিন্দা করি। কংগ্রেসের মধ্যে উগ্রপন্থীদের নিরস্ত করার জন্য আমরা গান্ধী অথবা নেহরুকে অনুরোধ করিনি। আমরা অবশ্য সুভাষচন্দ্র বোসের সঙ্গে

যোগাযোগ করেছিলাম যখন তিনি অন্তরীণ অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে জার্মানি ও জাপানে পৌঁছেছিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে সংগঠিত করার জন্য। আমরা তাঁকে পরিষ্কার করে জানাই যে অভিপ্রায় শুভ হলেও তাঁর পথ সাম্রাজ্যবাদের মূল সমস্যার সমাধান করতে পারবে না এবং এত সহজে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা যাবে না। এমনকি তিনি যদি ভারতে ব্রিটিশদের রক্ত ঝরতে সফলও হন, ইংরেজ আধিপত্যের বদলে সমগ্র এশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে জাপানের কর্তৃত্ব। সুতরাং জাতীয় মুক্তির সংগ্রামকে সাময়িকভাবে সাহায্য করার বিষয়ে জাপানের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনও মোহ পোষণ করা তাঁর উচিত হবে না। সম্পূর্ণ মতাদর্শগত কারণে আমরা তাঁর কাজের সমালোচনা করে থাকতে পারি। কিন্তু জাপানীদের সাহায্যে সশস্ত্র ক্যাডারদের সংগঠিত করে সাময়িক উপায়ে ভারতকে স্বাধীন করার তাঁর সমগ্র উদ্যোগ গ্রহণ বা টিকিয়ে রাখার অযোগ্য বলে আখ্যায়িত করলে জনগণের কাছ থেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করে দিত।

আমরা আরেকটি সাধারণ অবস্থান গ্রহণ করেছিলাম যে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কোন রকম ধর্মঘট করা যাবে না। তার পরিবর্তে শ্রমিক শ্রেণিকে অধিক উৎপাদনের চেষ্টা করতে হবে। যুদ্ধ প্রস্তুতির সহায়ক উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা সাধারণভাবে মোটেই সুবিবেচনার কাজ হবে না। যদি তা করে আমরা জাতীয়তাবাদী আবেগে তাড়িত হতাম তাহলে দেশ রক্ষা ও নাৎসিদের মোকাবিলা করার গোটা কাজটাই দারুণভাবে দুর্বল হয়ে পড়তো। অবশ্য অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে কোনও ধর্মঘট করা উচিত হবে না বলে উপস্থাপন করাটাকেও জনগণ ভুল স্লোগান হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন। শ্রমিকদের জীবন ধারণের সামান্যতম ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হয়েছিল। জীবিকা রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য উৎপাদন কাজে উৎসাহিত করার জন্য নিয়ন্ত্রক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদেরকে আমাদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করতে হয়েছিল। পার্টির পক্ষে আমরা যা করার কথা ভেবেছিলাম বাস্তবে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল করে পৌর কর্মচারীসহ শ্রমিকরা যখন ধর্মঘটে যোগদান

করলেন তখন পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। আমার মনে আছে অন্ধ্রপ্রদেশে পৌর শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট করেছিলেন। যুদ্ধকালে পৌর শ্রমিকরা ধর্মঘটে অবতীর্ণ হলে সাধারণত জনগণই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার হলেন। আমরা ঐ পুর শ্রমিক ধর্মঘটের বিরোধিতা করতে সক্ষম ছিলাম না। কারণ, তাহলে সমগ্র যুদ্ধ প্রস্তুতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হতো। গান্ধীও জাতীয় সার্বভৌমত্বের দাবিতে অনির্দিষ্টকালীন অনশন শুরু করেন। দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল যখন রীতিমত উত্তপ্ত তখন বিভিন্ন সমাজবাদী গোষ্ঠী গোপনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বোম্বাইতে যৌথভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অনুরোধ জানায়। আমরা পরিষ্কারভাবে তার বিরোধিতা করি।

স্বাভাবিক কারণেই শ্রমিকশ্রেণির উপর কমিউনিস্টদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। দেশজোড়া আমাদের ভিত্তি না থাকলেও তখন জাতীয় আবেগ এমন পর্যায়ে ছিল যে বিদ্রোহ করার জন্য আমাদের একটি মাত্র আহ্বানই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে অন্তত সঙ্কেত পাঠাতে পারতো। আমাদের অভিপ্রায় বা দৃষ্টিভঙ্গি তেমনটা ছিল না। বস্ত্র শিল্প শ্রমিকসহ প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়ন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ছিল। আমরা প্রকাশ্যে (ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে) তাদেরকে নিরস্ত করতে পারতাম না। কারণ দেশপ্রেমিক আন্দোলন থেকে তা আমাদের দূরে সরিয়ে দিত। প্রকাশ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রস্তুতির সমর্থক হিসেবে দাঁড়িয়ে আমরা নিজেদের পার্টিকে জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারি না। এই বোঝাপড়াটা কোত্থেকে এলো? উৎপাদন বিঘ্নিত করার জন্য আমাদের তরফে কোনওরকম উদ্যোগ যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরাট ক্ষতি করতে পারতো। যা পক্ষান্তরে ইতোমধ্যে বিপদগ্রস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নকে দুর্বল করে দিত। গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে এটা ছিল ভুল বোঝাপড়া।

১৯৫১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে গিয়ে আমরা যখন আমাদের সমস্যা ব্যাখ্যা করি তখন কমরেড স্তালিন বলেছিলেন যে আমাদের লাইন ভুল, আমাদের উচিত ছিল বামপন্থী আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল স্রোতধারার সঙ্গে যুক্ত করা। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তিনি অবশ্য আমাদের অবস্থানের প্রশংসা করেছিলেন, বিশেষতঃ

নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রশ্নে। তাঁর বাস্তব বিশ্লেষণ অনুযায়ী জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে ব্যাপক জনগণের সঙ্গে যুক্ত হতে আমাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। আমরা তখন কী করতে পারতাম সেই প্রশ্নে এখনও বিতর্ক চলছে। রেলপথ ও সড়ক অবরোধ করে এবং সাধারণ ধর্মঘট ডেকে যুদ্ধের জন্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত করা পর্যন্ত আমাদের যাওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আমরা খোলাখুলি অস্বীকার করতে পারতাম। অথবা সত্যাগ্রহ কর্মসূচীর মতো শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করে দেশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে বাধ্য করতে পারতাম। এ ধরনের কর্মপরিকল্পনার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকার কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতো তা যদিও বিতর্কের বিষয়, কিন্তু সেটাই করা উচিত ছিল। বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো এবং জনগণকে সমবেত করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টাও আমরা বিবেচনা করিনি। আমাদের সঙ্গবিহীন রাজনৈতিক লাইন সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত যা আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছিল তা হলো বন্দী কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবিতে আমাদের ক্লান্তিহীন প্রচারাভিযান এবং দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে একটি জাতীয় সরকার গঠনের জন্য আমাদের নিরলস দাবি। প্রকৃতপক্ষে ঐ প্রচারাভিযান চালানোর সময় আমাদের হাজার হাজার পার্টি কর্মীকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। যখন আমরা এসব বিক্ষোভ কর্মসূচী সংগঠিত করছিলাম তার বৈধতা কিন্তু আমাদের উপরই আরোপ করা হয়েছিল। সরকার কংগ্রেসের সমাবেশ ও জনসভাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এটা ছিল আমাদের পার্টিকে পরিমাপের গুরুত্বপূর্ণ দিক। জনগণ আমাদেরকে ব্রিটিশদের দুষ্কর্মের ভারবাহী হিসেবে প্রত্যক্ষ করতে পারেনি, কারণ সাধারণ ধর্মঘট এবং সুভাষচন্দ্র বোসসহ পঞ্চম বাহিনীর হিংসাত্মক বিরোধিতা করার পাশাপাশি আমরা কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবি জানিয়ে আসছিলাম। আমাদের তখনকার কার্যকলাপ একটা সীমা পর্যন্ত যুদ্ধের জন্য উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকতে পারে। কিন্তু আমাদেরকে জাতির আহ্বানে সাড়া দিতে হয়েছিল। পাশাপাশি আমরা

শক্তিশালী রাজনৈতিক আন্দোলন চালাচ্ছিলাম যেন যুদ্ধের জন্য ব্যয় অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতিতে জনগণ বিশেষত শ্রমিকশ্রেণি ও কৃষকদের উপর প্রচণ্ড রকমের বোঝা চাপানোর কারণ হিসেবে উল্লেখ না করা হয়। আমরা অনুভব করেছিলাম যে কেবলমাত্র ধনীদের উপর ট্যাক্স বসিয়েই অতিরিক্ত সম্পদ যোগাড় সম্ভব। আমরা আরও দাবি জানিয়েছিলাম সরকার যেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তরঙ্গের উপর দমন-পীড়নের পথ পরিহার করে।

আমাদের ঐ অবস্থান ছিল দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা থেকে জনগণ উপলব্ধি করেন যে আমরা জনগণের পক্ষে এবং সাম্যবাদী সমাজ গঠনের জন্য আমরা লড়াই করছি। ঐ সময় আমরা অনেকগুলি মৌলিক ইস্যু, যেমন সর্বস্তরে ব্যাপক আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি, যা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর অংশের জনগণকে আঘাত করেছিল, সেগুলি সরকারের সামনে তুলে ধরি। এটাও জনগণের মধ্যে আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার উন্নতি ঘটিয়েছিল। সাধারণ রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ছাড়াও দুটির বেশি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যেগুলি আমরা আমাদের পার্টির দলিলে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলাম। প্রথমত: যুদ্ধ চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যাবার পর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির বিরুদ্ধে বিচার শুরু হলে আমরা দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করি যে এই বিচার বন্ধ হওয়া উচিত। কেননা এর কার্যকলাপ একমাত্র দেশপ্রেমিক উদ্বেগ দ্বারাই তাড়িত হয়েছিল, সরকারের যুদ্ধ প্রস্তুতিতে অন্তর্ঘাত করার অভিপ্রায় থেকে নয়। বিচার বাতিলের জন্য আমাদের দাবির সমর্থনে আমরা সাধারণ ধর্মঘট এবং হরতালও পালন করি।

আমাদের আন্দোলনে প্রাথমিক বিপত্তির পর শ্রমিকশ্রেণি, কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যেও আই এন এ সৈনিকদের মুক্তি এবং দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির সমর্থনে আমরা প্রভাব বাড়াতে সমর্থ হই। আমাদের রাজনৈতিক কাজের লাইন আরও ক্ষতির হাত থেকে পার্টিকে উদ্ধার করে, যদিও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে কেবলমাত্র একটি সূক্ষ্মরেখা আমাদের অবস্থানকে পৃথক করে রেখেছিল। দ্বিতীয়ত, রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি (RIN)-র বিদ্রোহকে

আমরা প্রকাশ্যেই সমর্থন জানিয়েছিলাম। RIN সৈনিকদের সমর্থনে শ্রমিকশ্রেণির এক বিশাল সমাবেশও অনুষ্ঠিত করা হয়েছিল। যদিও সমাবেশটি পুরোপুরি আমাদেরই ছিল না, সেটিকে ঘিরে রীতিমতো বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছিল, আর আমরা ছিলাম সেই বিক্ষোভের সামনের সারিতে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ও পুলিস আমাদের ওপরই গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে আমাদের অগ্রণী কর্মী ও তাদের পরিবারের ৪০ জন নিহত হয়েছিলেন। জনগণ সবটাই স্বচক্ষে দেখেছিলেন। ঠিক ঐ সময়েই কংগ্রেস RIN বিদ্রোহের বিরোধিতা করে। যদিও নৌবাহিনীর সৈনিকদের রক্ষায় আমরা ছিলাম লড়াইয়ের সামনের সারিতে। এই বিক্ষোভও আমাদের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করেছিল, কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে আমাদের গৃহীত রাজনৈতিক লাইনের কারণে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটের মধ্যে যথার্থভাবে সংযোগ স্থাপন করে তা আমরা কার্যকরভাবে জনগণের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারিনি।

এমনকি পূর্ববর্তী সময় ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যেও কমরেড সরদেশাই ন্যাশনাল ফ্রন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলেন যে, আমাদের আন্দোলন বিশ্বের জনগণের সংগ্রামের অধীন এবং আমাদের উচিত সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন স্থগিত রাখা। আমরা অবশ্য তাঁর মতামত বাতিল করে দিয়ে জানাই যে এটা আমাদের বোঝাপড়া নয়। আমরা বলি যে, জাতীয় (মুক্তির) সংগ্রাম এবং পার্টির আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবস্থানের মধ্যে কোনওরকম দ্বন্দ্ব থাকা ঠিক নয়, বিশেষত সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আক্রমণের প্রশ্নে। আমরা আরও বলি যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশ্বের জনগণের সংগ্রামের অধীন হতে পারে না। পুরো মতাদর্শগত লড়াইয়ে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে প্রভাব বিস্তার করতে আমরা ব্যর্থ হই। অন্তত সাধারণ জনগণের এমনটাই উপলব্ধি ছিল।

সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে মানুষ যা খুশি বলতে পারেন। স্বাভাবিক কারণেই পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে মতাদর্শগত বিষয়ে পার্থক্য ছিল। যোশীকে অভিযুক্ত করা হয় এই বলে যে তিনি এমন

একটি রাজনৈতিক লাইন উপস্থিত করেছিলেন যাতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। সমগ্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পার্টি লাইনের সুস্পষ্ট রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অবশ্য বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন, যা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। যা হোক, এমন অনেকেই আছেন যারা আজও ফ্যাসিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে রাশিয়ার বিজয়কে স্বাগত জানিয়ে তাঁর, রাজনৈতিক লাইনের পক্ষে দাঁড়ান। আমি বলতে চাই যে কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয় নয়, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতের চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা মঞ্জুর করতে বাধ্য করেছিল। যদি সোভিয়েতের বিজয় সমগ্র উপনিবেশিক বিশ্বকে মুক্ত করতে পারতো তাহলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে গ্রহণ করতে আমাদের কোনও মাথা ব্যাথার কারণ থাকতো না। যাই ঘটে থাকুক না কেন জাতীয় (মুক্তির) আন্দোলনকে খোলাখুলি সমর্থন না করাটা ছিল আমাদের আন্দোলনের গুরুতর ব্যর্থতা।

আমি আগেই বলেছি যে, আমাদের ভাবমূর্তি রক্ষার অন্যতম কারণ ছিল জনগণের বিভিন্ন ইস্যুতে আমাদের ব্যাপক প্রচার। তাতে যে সর্ববৃহৎ অভিযানটি আমরা দেশব্যাপী পরিচালনা করেছিলাম তা ছিল বাংলার গুরুতর দুর্ভিক্ষের ফলে আক্রান্ত মানুষকে ত্রাণ সাহায্য করা। বাংলার গরিব মানুষকে সাহায্য করার জন্য আমাদের পার্টি সারা দেশে বিপুল সংখ্যক ডাক্তার ও স্বেচ্ছাসেবকদের সমবেত করেছিল। গুরুতরভাবে আক্রান্ত এলাকাগুলিতে স্থাপিত রিলিফ ক্যাম্পে পাঠাবার জন্য আমরা সারা দেশ থেকে বিরাট অংশের অর্থ ও খাদ্যশস্য সংগ্রহ করেছিলাম।

১৯৪২ সালের জুন মাস নাগাদ আমরা প্রকাশ্যে কাজ শুরু করি। আমাদের দায়িত্ব ছিল কর্মী বাহিনী ও জনগণের কাছে পার্টির নতুন লাইন ব্যাখ্যা করে বলা। এই উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করি। আমার মনে আছে আমি যখন গুড়িভাড়া সফরে যাই তখন কংগ্রেস কর্মীরা আমাদের মিটিং ভণ্ডুল করে দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমরা স্থানত্যাগ করিনি। ১০ হাজারেরও বেশি শ্রমিককে আমরা সমবেত করেছিলাম, আর কংগ্রেসের

দরদীরা জনসভার স্থলে মঞ্চ ঘিরে ফেলে। তারা আমাদের কাছে কৈফিয়ৎ দাবি করে, আমরা সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করি। তাদের দাবির কাছে আমরা মাথানত করিনি। ফলশ্রুতিতে সেখানে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়, কিন্তু আমরা আমাদের রক্ষা করতে সক্ষম হই। দন্ডমুড়ি রাজা গোপালা রাও আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য সেখানে ছিলেন। ঐ প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁরা সকলেই আমাদের পাশে দাঁড়ান। তাঁরা বলেন, কংগ্রেস কর্মীদের দাবির কাছে মাথানত না করে আমরা সঠিক কাজই করেছি। অনুরূপভাবে তেনালি এলাকায় আমরুথালারুতে বিরাট মারামারির ঘটনা ঘটে। সেখানে গঙ্গাধর রাও এবং অন্যান্যরা মাথা তুলে দাঁড়ায় ও আক্রমণকারীদের মেরে তাড়িয়ে দেয়। ঐ ঘটনাগুলির পর আমাদেরকে লাঠিশোটা দিয়ে জনগণের স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করতে হয়। জনসভাগুলিতে বিভিন্ন স্তরে নিরাপত্তা বিধানের জন্য চারটি গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল। কম বেশি মিলিটারী পুলিসের লাইনে ঐ গ্রুপগুলি তৈরি করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কংগ্রেস কর্মীরা ব্যাপক সংখ্যায় আমাদের সভাগুলি বানচাল করতে আসে। আমাদের কর্মীদল বা স্কোয়াডগুলি সুসংগঠিত হওয়ায় তারা সমুচিত প্রতিশোধ গ্রহণে সমর্থ হয়। তারপর কোন জায়গায় কংগ্রেসী গুন্ডারা আমাদের চারস্তরীয় নিরাপত্তা বেষ্টনী ভাঙতে পারেনি।

১৯৪৩ সালের শেষ অংশে আমাদের প্রচারাভিযান সম্পর্কে আমি আরেকটি ঘটনার কথা স্মরণ করতে পারছি। ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ইলরুতে মিলিত হয়েছিল। কাত্রাগাড্ডা নারায়ণ রাও তখন কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই আমরা তাকে ঐ মিটিং-এ পাঠাই। কাত্রাগাড্ডা ন্যাশনাল স্কুল ছিল মিটিংস্থান। কট্টর কংগ্রেস কর্মীরা তাকে মারধোর করে। যখন ধাক্কাধাক্কি বা মারামারি চলছিল আমাদের যুবকরা বাইরে ছিলেন। তার আর্ত চিৎকার শুনতে পেয়ে আমাদের কর্মীরা মিটিং হলে ঢুকে পড়ে, তাকে উদ্ধার করে। পুলিস শীঘ্রই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় এবং কংগ্রেস নেতা সঞ্জীব রেড্ডি আমাদের শান্ত করার জন্য এগিয়ে আসেন।

যুবকদের নিয়ে কোন সমস্যা নেই এই কথা বলে তিনি পুলিসকে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এভাবে আমাদের নেতৃত্বস্থানীয় কমরেড ও জমায়েতগুলিকে রক্ষা করতে হয়েছিল। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকে। অবশেষে ১৯৪৫ সালে কংগ্রেস নেতারা যখন জেল থেকে ছাড়া পান, আমাদের সকলকেই ক্রমশ জাতীয়তাবিরোধী অপবাদ দিয়ে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪৩ সালের ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান এবং কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলির নির্বাচনের আগে ঐ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়।

কংগ্রেস ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক মিথ্যা রটনার অভিযান চালায়। যার ফলে কংগ্রেসের অভিযোগের জবাবে পি সি যোশীকে তিনখণ্ডের বই লিখতে হয়েছিল। সি পি আই ও কংগ্রেসকে নিয়ে একটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য গান্ধীর প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধী আমাদের পার্টির উদ্দেশে কিছু মতাদর্শগত প্রশ্ন রেখেছিলেন। যোশীকে সেগুলিরই উত্তর দিতে হয়েছিল। পুরো যুদ্ধোত্তর পর্বে কৈফিয়ৎ প্রদান অভিযানকালে আমরা বামপন্থী দরদীদের সমর্থন হারাইনি, আমাদের সক্রিয় কর্মীরাও কেউ পার্টি ছেড়ে যাননি। যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজয়ী হয় এবং মতাদর্শগত ক্ষেত্রে সে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। নাৎসিদের অত্যাচারের সম্ভাবনা নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রস্তুতিকে সমর্থন করার আমাদের পার্টি লাইন সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। সুতরাং মতাদর্শগত প্রশ্নে অসঙ্গতির প্রশ্ন উঠে না। সংগঠনে কঠোর শৃঙ্খলা ছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ থাকায় অধিকাংশ কমিউনিস্টই আমাদের পেছনে সমবেত হয়েছিলেন। ফ্যাসিবাদ ও জাপানি মার্কা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিদ্বেষপূর্ণ ঘৃণা বিদ্যমান ছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়ার পর আমাদের স্বীকৃত সাংগঠনিক কাঠামো, বিশেষত পার্টি এবং কেন্দ্র স্থাপন, আমাদের পক্ষে জনমত গড়ে তোলাই প্রধান অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৪৩ সালের গোড়ায় সরকারিভাবে অনুষ্ঠিত প্রথম পার্টি কংগ্রেসে পার্টির স্বীকৃত (বা সরকারি) লাইন নেতৃস্থানীয় ক্যাডারদের কাছে ব্যাখ্যা করা হয়।

তার আগে আমাদের সদর কার্যালয় স্থাপন ও পার্টির জার্নাল (মুখপত্র) প্রকাশ করতে হয়। আমাকে বোম্বাইতে পার্টি কেন্দ্র ও প্রকাশনা ভবন স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়। বর্তমানে যেখানে রাজভবন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে পার্টির মহারাষ্ট্র রাজ্য কমিটির সদর দপ্তর ছিল। খেতওয়াড়িতে পার্টি কেন্দ্র ও প্রকাশনা ভবন গড়ে তুলতে প্রায় এক বছরের মতো সময় লেগেছিল। কিন্তু কয়েক মাস পর দেশের বিভিন্ন অংশে গেরিলা গ্রুপগুলির ট্রেনিং-র দায়িত্ব দেওয়া হয় আমার ওপর। ঐ গ্রুপগুলিকে সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য আমাকে অবিরত সারা দেশে ঘুরে বেড়াতে হতো।

বোম্বাইতে আমাদের প্রকাশনা বিভাগের নাম ছিল নিউ এজ প্রেস। কিন্তু আমরা আমাদের মুখপত্রের নাম দিয়েছিলাম পিপল্‌স ওয়্যার বা জনযুদ্ধ। ইতোমধ্যে মাদ্রাজেও আমাদের নিউ এজ প্রেস ছিল। যার ফলে বোম্বাইয়ের প্রেসের জন্য এই নামটি বেছে নেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হলে পর আমরা মুখপত্রের নাম বদলে করি 'নিউ এজ'। পরবর্তীতে আমরা পিপলস্ পাবলিশিং হাউস শুরু করি। আমি আর্থিক ও সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলাম। কমরেড অধিকারী বিভিন্ন পুস্তিকা ও পার্টি দলিল প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ করেন। মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের লেখা নিয়ে গ্রন্থমালা প্রকাশ করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কেও আমরা প্রচুর দলিল প্রকাশ করি। অন্ধ্রেও একটি অফিসসহ 'প্রজাশক্তি' কাজ শুরু করে। ১৯৪৫ সালে এ্ সাপ্তাহিকীটিকে দৈনিকে রূপান্তরিত করা হয়। এটি ছিল ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম দৈনিক। 'দেশাভিমানী' তখনও ছিল সাপ্তাহিকী। বাংলার কমরেডরা 'স্বাধীনতা' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন তারও পরে। গেরিলা গ্রুপগুলিকে ট্রেনিং প্রদানের ব্যাপারে আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু এটা ঘটনা যে সশস্ত্র গ্রুপগুলিকে আমরা সংগঠিত করেছিলাম। একইসময়ে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে আমাদের কাজের ভালো অগ্রগতি ঘটেছিল। ১৯৪৩ সালে পার্টির প্রথম কংগ্রেসে আমরা কমরেড রাজেশ্বর রাওকে অন্ধ্র কমিটির সম্পাদক পদে নির্বাচিত করি। পার্টি কেন্দ্রে আমি যে দায়িত্ব পালন করে আসছিলাম আমাকে সেটাই চালিয়ে

যেতে বলা হলো। পার্টি কেন্দ্রে আমার কোন সাংগঠনিক পদ ছিল না। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের কমিটিগুলির সর্বাঙ্গীন দায়িত্ব আমার ওপরই অর্পণ করা হয়েছিল। বিভিন্ন রাজ্যে গেরিলা স্কোয়াডগুলির ট্রেনিং-র দায়িত্ব দেখাশুনা ছাড়াও পার্টি কেন্দ্র এবং দক্ষিণ ভারতের আন্দোলনের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী ছিলাম আমি! কৃষ্ণ পিল্লাই ছিলেন কেরালা কমিটির সম্পাদক।

অন্ধ্রতে আমাদের কাজ আমরা খুব ভালই করেছিলাম। ১৯৪৩ সালে আমি ও রাজেশ্বর রাও কীভাবে সংগঠনকে গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে কর্মীদের কীভাবে শিক্ষিত করে তোলা যায় সে সম্পর্কে বিভিন্ন সার্কুলারের খসড়া তৈরি করি। রাজেশ্বর রাও 'পার্টি নির্মানম' নামে একটি বই লেখেন। বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের ওপর দলিলাদি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চালাসানি বাসুদেব রাও সেগুলি তেলগু ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। ঐ সকল সাহিত্য সংগঠনকে সংহত করতে আমাদের সাহায্য করেছিল। ১৯৪৩ সালে যখন আমরা পার্টি কনফারেন্স সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলাম, তখন পার্টি কেন্দ্র ও রাজ্য কমিটিগুলিতে অর্থ যোগানের প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। অর্থ সংগ্রহ আমাদের প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে আমরা সমস্ত নেতৃস্থানীয় কমরেডদের কাছে তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থের সর্বাধিক অংশ পার্টিকে দান করতে আহ্বান জানাই। চন্দ্র রাজেশ্বর রাও, মাকিনেনি বাসবপুন্নাইয়া, মণিকোণ্ডা সুব্বা রাও, মানকোণ্ডা পূর্ববর্তী এবং বিভিন্ন জেলার নেতৃস্থানীয় কমরেডরা তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে দেন এবং তাঁদের বয়স্ক মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপকারার্থে যতটা কম অর্থ রাখা যায় তা রেখে বাকি আর্থের সবটাই পার্টিকে দান করেন। তখন (পার্টি) কেন্দ্রের জন্য আমাদের কোটা নির্দিষ্ট ছিল ৫০,০০০ টাকা।

আমরা সেই অর্থ সংগ্রহ করে তা পার্টির সদর দপ্তরের হাতে তুলে দিই। আমরা যে পদ্ধতিতে অর্থ সংগ্রহ করি কেন্দ্রীয় দপ্তর তাতে বিস্ময় প্রকাশ করে। তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেন যেসব কমরেড তাঁদের সম্পত্তির সিংহভাগ অংশই এভাবে পার্টিকে দান করেছেন তারা কীভাবে বেঁচে থাকবেন।

আমি নেতৃত্বকে বলি যে এটা কোন সমস্যা নয়। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে জনগণের কাছ থেকে আমরা আরও অর্থ সংগ্রহ করবো। অবস্থা যাহাই হোক না কেন, কমিউনিস্টদের নিজস্ব সম্পত্তি রাখার প্রয়োজন নেই কিন্তু তাদের দায়িত্ব রয়েছে পিতা-মাতা ও পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের দেখাশুনা করার। আমি নেতৃত্বকে জানাই যে বর্তমান সদস্যদের কাছ থেকে দান সংগ্রহ করার জন্যই শুধু আমরা এই ভাবনা-চিন্তা করছিনা। আরও নতুন নতুন মানুষ পার্টিতে যোগদান করবেন এবং তাদের আয়ের ভালো অংশ পার্টিকে দান করবেন। তাছাড়া, জনগণের দানের উপরও আমরা ভরসা করতে পারি।

সাথে সাথে আমাদের সমস্ত সর্বক্ষণের কর্মীদের উদ্দেশ্যে আমরা সার্কুলার পাঠাই যেন কারুরই তিনের বেশি সন্তান না হয়। আমাদের প্রত্যয় সম্পর্কে আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ ছিলাম। প্রজাদের কিন্তু কৃষি উৎপাদনের ছয় ভাগের এক ভাগ বা পাঁচ ভাগের এক ভাগ জমির মালিকদের প্রদানের শ্লোগান বাস্তবায়িত করার প্রশ্নে অন্ধ্রের কমরেড এবং পার্টি কেন্দ্রের মধ্যে ছোটখাট কিছু মতানৈক্য ছিল। রাজেশ্বর রাও বুঝানোর চেষ্টা করেন যে এ ধরনের শ্লোগান দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি এবং অন্ধ্রে যেহেতু প্রজারা মোট কৃষি উৎপাদনের তিন-চতুর্থাংশ পর্যন্ত শেয়ার জমির মালিকদের দিতে ইচ্ছুক তাই এই শ্লোগান তৃণমূল স্তরে বাস্তবায়িত করা কঠিন। তিনি বলেন, পার্টি যদি প্রজাদের উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকও জমির মালিকদের দিতে সফল হয় তাহলেই তা বিরাট সাফল্য বলে বিবেচিত হতে পারে। প্রজাদের বৃহত্তর স্বার্থে আমি পার্টি কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি। স্বভাবতই পার্টি কেন্দ্র অন্ধ্র কমিটিকে 'ধনী -মুখী' বলে চিহ্নিত করে যা প্রজাদের স্বার্থে লড়াই করার পরিবর্তে জমির মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করছিল। পার্থক্যগুলি ছিল খুবই অকৃত্রিম এবং অন্ধ্র কমরেডদের যুক্তি যে রাজ্যের বাস্তব পরিস্থিতি পার্টি কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত রূপায়ণের উপযুক্ত ছিল না তাও ছিল যথার্থ।

প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্লোগান সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। কিন্তু যখন তা রূপায়ণের প্রশ্ন আসে তখন পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ পরিপক্ক হতে হবে। আমরা গায়ের জোরে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারি না যদি না জনগণ এজন্য প্রস্তুত হন

এবং লড়াই করতে তৈরি থাকেন। যদি জনগণ বিশ্বাস করেন যে কোন শ্লোগান বাস্তবায়িত করা অসম্ভব তাহলে তারা লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবেন না। কোন স্লোগানকে এগিয়ে নেবার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনগণের চেতনা ও বাস্তব পরিস্থিতিকে আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে। প্রচারের প্রোপাগান্ডা স্লোগান, বিক্ষোভ প্রদর্শনের (এজিটেশন) স্লোগান এবং লড়াইয়ের (এ্যাকশন) স্লোগান সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। আমরা এই পার্থক্য বুঝতে পারিনা এবং তিনটিকে মিশিয়ে ফেলে সর্বত্র বিভ্রান্তি সৃষ্টি করি।

কোন অবস্থাতেই ঐ সময় অন্ধ্রের তৎকালীন পরিস্থিতির উপযোগী সঠিক রাজনৈতিক লাইন নিয়ে আমরা সওয়াল করতে পারিনি। এ কারণেই বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়াকে বিবেচনায় রেখে যেভাবে আন্দোলনকে বিকশিত করা উচিত ছিল তা আমরা করতে পারিনি। অবশ্য সারা রাজ্যব্যাপী জনগণের বিভিন্ন অংশ, মূলত: কৃষক সাধারণকে সমবেত করার জন্য আমরা খুবই সক্রিয় ছিলাম। আমাদের দায়বদ্ধ যুব কর্মী ছিল। আমার মনে আছে জেলা স্তরের সভা ছাড়াও ১৯৪৪ সালে বিজয়ওয়াড়ায় আমরা এক বিশাল কৃষক সম্মেলন সংগঠিত করেছিলাম। বিজয়ওয়াড়ার সারা ভারত কিষাণ সভার ঐ সম্মেলনে এক লক্ষেরও বেশি কৃষক অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলন মঞ্চে কৃষক আন্দোলনের খ্যাতনামা নেতৃত্ব স্বামী সহজানন্দ, এন জি রঙ্গ এবং বিহারের কারিয়ানন্দ শর্মা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে ১৯৪৩ সালে অমৃতসর থেকে ৩০ মাইল দূরে ভাকনাতে আমরা এ ধরনের আরেকটি সম্মেলন সংগঠিত করেছিলাম। কমরেড পারুলেকর, ভবানী সেন এবং রসুল ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তবে বিজয়ওয়াড়াতে যেভাবে কৃষক সমাবেশ সংগঠিত করেছিলাম তা ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছিল। প্রায় ৫০ হাজার অংশগ্রহণকারীর জন্য আমরা আহারের ব্যবস্থা করেছিলাম। ৪০০০ স্বেচ্ছাসেবককে সমবেত করেছিলাম। ঐ সময়ে দেশে ওটাই ছিল কৃষকদের বৃহত্তম সমাবেশ।

জি পার্থসারথি যিনি এখন সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন তিনি তখন 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন। পরে তিনি আমাকে বলেছিলেন

যে ইতোপূর্বে তিনি কংগ্রেসের অনেক বড় বড় সম্মেলন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তবে এটাই প্রথম যে তিনি একাই সুসংগঠিত সমাবেশ দেখতে পেলেন যেখানে শুধুমাত্র ডেলিগেট নয়, পরন্তু প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর থাকা, খাওয়া ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থাসহ দেখভালের সুব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এ ধরনের বিরাট বিরাট সমাবেশ করা আমাদের পক্ষে তখন কঠিন ছিল না। প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে আমরা নজর রাখতাম। সম্পদ ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহসহ সমাবেশ স্থলে যত্নের সঙ্গে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার আয়োজন করা হতো। এমন কি রাজেশ্বর এ ধরনের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সমাবেশের আয়োজন করতে সক্ষম ছিলেন। আমার মনে আছে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৪ সালের এপ্রিলে। অনুরূপ বছরগুলিতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে শামিল করে সভা-সমাবেশ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিজয়ওয়াড়ার সেসব অভিজ্ঞতা আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। অন্ধ্রে কিষাণ সভা ছিল আমাদের পার্টির অন্যতম বৃহত্তম সাফল্য। পরবর্তী কিষাণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালে বাংলার নেত্রকোণায় (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত)।

অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বন্দর সেচ খালকে পলিমুক্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করি। খালের তলদেশ সমতল হয়ে যাওয়ায় সেচের জলের প্রবাহ বাধামুক্ত বা মসৃণ ছিল না। যথেষ্ট শ্রমশক্তির অভাবে ইঞ্জিনীয়ারগণ পলি অপসারণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারছিলেন না। নামমাত্র মজুরিতে আমরা সেই দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে যাই। এই কাজে অংশ নেয়ার জন্য আমরা পার্টি সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাই। স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আমরা শুধু খাবারের ব্যবস্থা করি, কিন্তু অন্যদেরকে মজুরিও প্রদান করা হয়েছিল। বন্দর খাল এবং ইস্ট ব্যাঙ্ক খালের খনন কাজ এক মাসেরও কম সময়ে সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। মজুর এবং পার্টি স্বেচ্ছাসেবকদের সমবেত করার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা ছিল রীতিমত এক বিরাট সাফল্য। কৃষকদের ওপর আমাদের কাজের বিরাট প্রভাব পড়েছিল। সাথে সাথে কোনো কোনো মহল থেকে আমাদের কাজের সমালোচনা করে বলা হয়েছিল আমরা যা করেছি তা সংস্কারমূলক। তারা বলেন, খাল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারের। বড় ধরনের কাজের দায়িত্ব

গ্রহণ করা উচিত হবে কি হবে না তা নিয়ে অন্ধ্র কমিটিতেও মতানৈক্য ছিল। তবে অধিকাংশ মানুষ আমাদের কাজের প্রশংসা করেছিলেন, যা আমার যুক্তির যথার্থতাই প্রমাণ করে। কেন্দ্রীয় কমিটিও খাল খননে আমাদের কাজের প্রশংসা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বন্দরখাল পলিমুক্ত করার কাজের অভিজ্ঞতা নেত্রকোণা কিষাণ সম্মেলনে প্রতিনিধিগণকে মডেল হিসেবে দেওয়া হয়েছিল যাতে প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ এলাকায় তা বাস্তবায়িত করতে পারেন। পরবর্তীকালে অন্ধ্রের বিভিন্ন গ্রামে আমরা ব্যাপক আকারে সেচখাল খনন ও জলাধারগুলিকে পলিমুক্ত করার দায়িত্ব পালন করি।

অন্ধ্রে, আরও নির্দিষ্ট করে বললে কৃষ্ণায়, সংগঠনকে সংহত করার প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে আমরা ভেন্টাপ্রাগাড়ার কাছে পামুলাপাড়ুতে যাই। এটা ছিল ১৯৪২ সালের শেষের দিকে। অঞ্চলটি কংগ্রেসের শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল— এই দিক থেকে দেখলে ঐ সমাবেশটিও সফল হয়েছিল। আমরা এক বিশাল মিছিল বের করেছিলাম এবং আমরা যখন দোসাপাড়ুর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম তখন কংগ্রেস কর্মীরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বাভাবিক কারণেই আমাদেরকে তাদের উপর প্রতি-আক্রমণ সংগঠিত করতে হয়। দলবদ্ধভাবে কংগ্রেস দরদিদের বাড়ি বাড়ি ঢুকে তাদের খুঁজে বের করার কাজ থেকে আমাদের স্কোয়াডগুলিকে নিরস্ত করা চন্দ্র রাজেশ্বর রাও এবং আমার এক নারকীয় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় কংগ্রেসীরা তাদের পরিবারের লোকজনদেরকেও সামনে ঠেলে দেয়। এই আক্রমণের ঘটনা আমাদের পার্টি ও কংগ্রেসের মধ্যে কলহের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক অপপ্রচার করার তখন কিন্তু এটা (আক্রমণ) কংগ্রেসের পাওনা ছিল। তারা আমাদের বিরুদ্ধে, বিশেষত ব্যক্তিগতভাবে আমার বিরুদ্ধে সমস্ত রকম গুজব রটাতো এবং জঘন্য সব লেখালেখি করতো। তারা ব্যঙ্গ নাটক লিখে আমাকে লম্পট বলে আক্রমণ করতো। ঐ নাটকে আমার নাম দেওয়া হয়েছিল সুন্দাইয়া। স্বাভাবিক কারণেই আমাদের কর্মীরা ক্রোধে ফুঁসছিল। মাড্ডুকুরি চন্দ্রম এতটাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি ঐসব বদমাশদের, যারা আমার বিরুদ্ধে কুৎসার অভিযান চালাচ্ছিল, তাদের হত্যা করারই শপথ গ্রহণ করেন এমন কি ব্যক্তি সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়ার

কারণে পার্টি যদি তাকে বহিষ্কারও করে। কংগ্রেসের মিথ্যা কুৎসা, রটনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ছিল এমনটাই উগ্র। অবশ্য কংগ্রেসীদের সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করে কমরেড মাড্ডুকরি চন্দ্রশেখর রাও রোচগুন্টা শীর্ষক একটি শক্তিশালী প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমাদের আন্দোলনও ছিল খুবই সক্রিয়। আমরা ব্যাপক আকারে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ চালিয়ে এবং গ্রাম স্তরে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে কমরেড এম বাসবপুন্নাইয়া ও অন্যরা সহায়ক ছিলেন। ঐভাবে কমরেড বাসবপুন্নাইয়া সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে বেশি যুক্ত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন খুবই শক্তিশালী বক্তা। আমরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির এবং মহিলাদের জন্য ক্লাশ সংগঠিত করেছিলাম। জাপানী জঙ্গী জেট বিমান কর্তৃক ওপর থেকে বোমা বর্ষণের ক্ষেত্রে অগ্নি নির্বাপণ সম্পর্কে আমরা ক্লাশের আয়োজন করেছিলাম। কংগ্রেস নেতাদের দিক থেকে হুমকি মোকাবিলা করে যুব লীগের সদস্যরা এসব কাজে সক্রিয় ছিলেন। আমাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আক্রোশের প্রধান কারণ ছিল স্বাধীনতার জন্য তাদের সংগ্রামে আমরা অংশগ্রহণ করিনি। আমরা যদি বিপুল সংখ্যায় তাদের সঙ্গে সংগ্রামে শামিল হতাম তাহলে সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে সরকার অচল হয়ে যেতো। তারা অভিযোগ করে যে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পেছনে আমরা আমাদের সম্পূর্ণ প্রভাব ও সাংগঠনিক ক্ষমতা নিয়োজিত করিনি। কংগ্রেস কর্মীদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজও আমরা প্রতিহত করেছিলাম। একারণেই ওরা আমাদের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ ছিল এবং জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি বলে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিল।

এখন আমি তেলেঙ্গানা অঞ্চলে আমাদের কাজের ব্যাখ্যা দেবো। ১৯৪০-৪২ সালে গোপনে কাজ করার সময় কমরেড চন্দ্র রাজেশ্বর রাও যিনি কৃষ্ণা জেলার কাজের দায়িত্বে ছিলেন বাম দরদীদের, বিশেষত তেলেঙ্গানার অন্ধ্র সহায়তার সক্রিয় কর্মীদের সঙ্গে, সংযোগ স্থাপন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তাদেরকে কমিউনিস্ট আন্দোলনে নিয়ে আসেন। ঐসব কমরেডদের সকলকেই নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে পার্টির বাঁধনে সংগঠিত করা হয়।

আগে ওদের সঙ্গে আমাদের শুধুমাত্র নিয়ম বহির্ভূত যোগাযোগ ছিল। ১৯৪০ সালের পরেই কেবল প্রক্রিয়াটি মন্থন হতে শুরু করে। আগে ১৯৩৫-৩৬ সালে ঐ কমরেডদের কোন একটি সমিতি ছিল, কিন্তু সেটি ছিল মূলত পাঠচক্র ও আলোচনার মঞ্চ। এসব কাজ করার জন্য আমাদের মাকদুমের মতো কমরেডরা ছিলেন। তারা ছিলেন রাজ্য কংগ্রেস সত্যাগ্রহ এবং এ ধরনের অন্যান্য আন্দোলন, বিশেষ করে অন্ধ্র জনসংঘ ও লাইব্রেরি আন্দোলনের অংশ। ১৯৪০ সালের পরই ঐসব কমরেডদের সঠিকভাবে সংগঠিত করা হয়েছিল।

সমস্ত অংশের যুবকরাই পার্টির বাঁধনের ভেতরে এসে গিয়েছিলেন। রবি নারায়ণ রেড্ডি, বদ্দম ইয়েল্লা রেড্ডি, সি এইচ লক্ষ্মী নরসাইয়া, সর্বদেবভালো রামামাথন, আরুৎলা লক্ষ্মী নরসিমা রেড্ডি, দেবুলাপল্লি ভেঙ্কটেশ্বর রাও এবং অন্যারা অন্ধ্র মহাসভার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে তারা সকলেই ছিলেন জঙ্গী এবং বরগুলা রামকৃষ্ণ রাও, মাড্ডুমালা রামচন্দ্র রাও, নরসিঙ্গ রাও, মদপতি হনুমন্ত রাও এবং কোন্ডা ভেঙ্কট রঙ্গা রেড্ডির নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস গ্রুপের বিরোধী। ১৯৪২ সালে চূড়ান্তভাবে (পার্টির ওপর থেকে) নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পরও আমাদের আন্দোলন তখনো পর্যন্ত নিজামের রাজ্যে গোপনই ছিল। আমাদের একমাত্র প্রকাশ্য মঞ্চ ছিল অন্ধ্র মহাসভা। ইতোমধ্যে জমিদাররা গরিব কৃষক ও খামার মজুরদের বিরুদ্ধে আক্রমণমুখী হয়ে উঠেন। যে ব্যাপকভিত্তিক জঙ্গী আন্দোলন আমরা পরিচালনা করেছিলাম সে সম্পর্কে আমরা মহাসভা কমরেডদের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম। শেষ পর্যন্ত রবি নারায়ণ রেড্ডি, দেবুলাপল্লী ভেঙ্কটশ্বর রাও, সি লক্ষ্মী নরসাইয়া এবং আরোও অনেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে চলে আসেন, কিন্তু (তাদের) পতাকা তখনও ছিল অন্ধ্র মহাসভার। তাই আমাদের প্রভাবে মহাসভা সামন্ত প্রভু এবং অত্যাচারী নিজাম শাসনের বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামের ডাক দেয়। ১৯৪০ সালের শুরু থেকেই আমরা দাবি জানাতে থাকি যেন নিজাম শাসিত হায়দ্রাবাদ রাজ্যের অবসান ঘটানো হয়। সব কাজটাই আমরা সাফল্যের সঙ্গে সংগঠিত করতে পারিনি। কিন্তু এই মর্মে কমিউনিস্ট পার্টির লাইন ছিল। তাই প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের স্লোগানের মতো

স্লোগানসমূহ গোটা কাজটা সম্পূর্ণ করে।

সামন্তবাদী জমিদার এবং দেশমুখদের বিরুদ্ধে আমাদের জঙ্গী সংগ্রাম কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশের মনঃপূত হয়নি। তারা শুধু গরিবদের জন কিছু সুযোগ - সুবিধা চেয়েছিল। এই প্রশ্নে (তাদের মধ্যে) সুস্পষ্ট বিভাজন সৃষ্টি হয়েছিল। এহেন অবস্থায় রবি নারায়ণ রেড্ডি (অন্ধ্র মহাসভার সভাপতি) নির্বাচিত হন ভুবনগিরিতে। কংগ্রেস পরবর্তী সময়ে তা পুনর্দখলের চেষ্টা করলেও সফল হয়নি। তারা আমাদের সংগ্রাম থেকে নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নিজেদের চলার পথ ঠিক করে নেয়। যাই হোক মানুষকে সমবেত করার প্রচণ্ড ক্ষমতা ছিল আমাদের।১৯৪৫ সাল নাগাদ আমরা যখন খাম্মামে আমাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করি তখনও এই বিভাজনটা ছিল। অধিকাংশ মানুষই আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এই সময়ে গোটা সংগঠনকে পরিচালনা করেছিলেন রাজেশ্বর রাও। ঐ জনসমাবেশ ছিল মহাসভা পরিচালিত অন্যতম বৃহত্তম সমাবেশ। সমাবেশে আমি বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাদেরকে পরিচালিত করেছিলাম। জনসমাবেশে কয়েকজন কমরেড প্রস্তাব করেন যে অন্ধ্র কমিটির পক্ষে কোনো একজন সমাবেশে ভাষণ দিন। আমি যেহেতু সেখানে হজির ছিলাম তারা আমাকেই ভাষণ দিতে অনুরোধ করেন। আমি তাদের বলি যে সময় এলে অবশ্যই আমি ভাষণ দেবো, কিন্তু অন্যদের ভাষণ শেষ করতে দিন। নিজামের রাজ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় আমরা মহাসভার সঙ্গে প্রকাশ্যে নিজেদের অভিন্নরূপে দেখাতে চাইনি। তবে আমাদের সংগঠন ছিল রাজ্যভিত্তিক ও সুসংগঠিত। করিমনগর, লালগোন্ডা, ওয়ারাঙাল ও এমন কি মহাবুবনগরেও ১৯৪৫ সালের শেষ নাগাদ খাম্মামে হায়দাবাদ, মেডাক, ছিল আমাদের সমর্থনের শক্তিশালী ভিত। আমি সেখানে বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার কাজ করছিলাম যা প্রত্যেকেই জানতো।

যেখানে মহাসভা সক্রিয় ছিল সেখানেই শক্তিশালী নেতৃত্বসহ বামপন্থী গ্রুপগুলির আবির্ভাব ঘটে। এখানে আমি বলতে চাই যে রবি নারায়ণ রেড্ডি, বদ্দম ইয়েল্লা রেড্ডি এবং সি লক্ষ্মী নরসাইয়াকে যদি আমরা জয় করে না আনতে পারতাম তবে সমগ্র তেলেঙ্গানা অঞ্চলের মতো কমিউনিস্ট আন্দোলনের

বিস্তৃতি ঘটতো না। মহাসভা আগেই গড়ে উঠেছিল। তাকে ভয় দেখিয়ে গন্তব্য পথ পরিবর্তনে বাধ্য করা হয়নি, কার্যত সঠিক মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক দিশা দেখিয়ে (মহাসভাকে) পরিবর্তিত করা হয়েছিল শক্তিশালী কমিউনিস্ট আন্দোলনে। সুতরাং সভার (অর্থাৎ মহাসভার) নরমপন্থী অংশ সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আমাদের সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। কারণ আমরা ছিলাম অধিকতর জঙ্গী বা সংগ্রামী, আর এই সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছিল জমিদার ও নিজামের স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে।

যথাসময়ে মহাসভা দেশব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করে, অন্তত তেলেঙ্গানার জনগণের উপলব্ধি ছিল তেমনই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে একতাই ছিল আমাদের স্লোগান অবশ্যই পরিবর্ত হিসেবে পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা নিজামের পাশে থাকতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু অন্তবর্তী সরকারে মোসলমান ও অমোসলমানদের প্রত্যেকেরই ৫০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। আমরা বলেছিলাম যুদ্ধকালীন সময়ে কাজ করার উদ্দেশ্যে এবং ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য জনগণ ও সম্পদ সংহত করার স্বার্থে নিজামের অনুগত লোকজনদের বাদ দিয়ে অবিলম্বে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করতে হবে। আমরা আরও বলেছিলাম যে জনশক্তি ও সম্পদ সংগ্রহের জন্য শক্তি প্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করা হবে না, জোর করে কোন উচ্ছেদ করা হবে না, কৃষি সেসসহ কোনোরকম ট্যাক্সও আদায় করা হবে না। পরে আমরা বুঝতে পারি যে (অর্ন্তবর্তী সরকারে) মোসলমান ও অমোসলমানদের সমান প্রতিনিধিত্বের দাবি সঠিক ছিল না, ছিল একেবারেই সংস্কারমূলক। নিছক একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠনের সদিচ্ছা থেকেই অন্ধ্র কমিটি এই স্লোগানটি তৈরি করেছিল। পি সি যোশীর নেতৃত্বাধীন পার্টি কেন্দ্রও আমাদের যুক্তির সঙ্গে সহমত পোষণ করেছিলো। আমরা ভেবেছিলাম অন্তর্বর্তী সরকারে সমপ্রতিনিধিত্ব হবে বিরাট সাফল্য। যা বিরাট সংখ্যায় মুসলীমদের আমাদের সংগঠনে টেনে আনতে পারবে। অন্যান্যদের সঙ্গে তাদেরকেও যদি সমান প্রতিনিধিত্বের সুযোগ না দেওয়া হয় তাহলে নিজাম ও জমিদারদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামে তাদের যোগদানের প্রশ্নই আসবেনা। শেষ পর্যন্ত ১৯৪৪ সালে সংগ্রাম তীব্র করে তোলার

পর আমরা ঐ স্লোগান পরিত্যাগ করি।

আমরা যতই সংগ্রাম তীব্র করে তুলছিলাম ততই জমিদাররা এবং নিজাম সরকার তাদের অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমাদের কর্মী ও দরদীদের বিরুদ্ধে পাশবিক নির্যাতনের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ভি নরসীমা রেড্ডির ওপর নিপীড়ন চালানো হয়েছিল। ওরা তাকে নৃশংসভাবে পেটায় এবং মুখে প্রস্রাবও করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জমিদার ভয়ঙ্কর অপরাধীদের নিয়োগ করে অগ্রণী কর্মীদের খুন করে। এসব ঘটনার কথা আমি সবিস্তারে বর্ণনা করেছি আমার 'তেলেঙ্গানার জনগণের সংগ্রাম ও তার শিক্ষা' গ্রন্থে। ১৯৪৫ সালের শেষ নাগাদ এবং ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে সারা দেশব্যাপী আলাদা - আলোচনা শুরু হয়। এক যুদ্ধোত্তর জাতীয়তাবাদী স্ফূরণ ঘটে যায়। ঐ পরিস্থিতিতে আমাদের দাবি ছিল নিজাম যেন ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে তা অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে তুলে দেয়। আমরা আরও দাবি করেছিলাম যে চাষীদের জমির মালিকানা দেওয়া হোক এবং দাস শ্রমিক প্রথার অবসান হোক। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমরা দাবি করেছিলাম যে হায়দ্রাবাদ রাজ্যকে যেন ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা হয়।

১৯৭৪ সালে দেওয়া কমরেড সুন্দরাইয়ার সাক্ষাৎকার

জাত, শ্রেণি এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের গোড়ার দিকের সংগঠন

[১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ সাল অর্থাৎ কমরেড সুন্দরাইয়ার কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের আগে কংগ্রেসের মধ্যে থেকে কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে কাজ করার যে অভিজ্ঞতা এখানে তা পুনর্মুদ্রিত হলো। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যুব কর্মীরা কিভাবে কমিউনিস্ট মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং অন্ধ্র রাজ্যে পার্টি গঠনে সম্ভাবনাময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হয়েছে। উচ্চবর্ণের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইতে কিভাবে নিচুবর্ণের লোকেরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন তার বর্ণনাও রয়েছে। কমিউনিস্ট মতাদর্শে প্রভাবিত হয়ে যুবদের দ্বারা গণআন্দোলন সংগঠিত করার এই ধরনের উদ্যোগ নিশ্চিতভাবেই কংগ্রেস পরিচালিত কৃষক আন্দোলন থেকে সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন ছিল। নিচে কমরেড সুন্দরাইয়ার সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো]

জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস এবং গ্রামীণ কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে সম্পর্ক প্রসঙ্গে

১৯২৯ সাল নাগাদ আমি গান্ধীজি, নেহরু ও তিলকের রচনার প্রভাবে ভারতীয় রাজনীতির সাথে ভালভাবে পরিচিত হই এবং কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে যোগদান করি। ঐ সময়ে আমার গ্রাম, আমার বাড়ির নিজস্ব অভিজ্ঞতা ছিল— কৃষি শ্রমিকরা বিশেষত হরিজনরা যথেচ্ছভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। আমি তাই তাদের প্রতি সঠিক আচরণের কথা প্রচার করে প্রতিবাদে শামিল হই। তখন গান্ধীজি, বিবেকানন্দ এবং মানবতাবাদীদের প্রভাব ও 'ভেমনা (Vemana)' -র সময় থেকে সমাজ সংস্কারকদের শিক্ষায় জাত-পাতহীন গণতন্ত্রের উপদেশ দেওয়া হতো।

বস্তুতপক্ষে ১৯২৮-২৯ সালে গান্ধীজি যখন হরিজনদের জন্য প্রচারাভিযান চালাচ্ছিলেন আমরাও তাতে শামিল হয়েছিলাম। ১৯২৯ সালে আমরা যখন লয়োলা কলেজে পড়ছিলাম, তখন বামপন্থী ছাত্রদের নিয়ে একটা ছোট দল গঠন করেছিলাম। কাকিনাড়া, পশ্চিম গোদাবরী, কৃষ্ণা জেলা এবং মাদ্রাজের কিছু ছাত্রের সাথেও এই দলের সংযোগ ছিল।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে এইচ ডি রাজা মাদ্রাজে এসেছিলেন। তিনি আমাদের কমিউনিস্ট ইস্তেহারের একটা কপি দিয়েছিলেন। পূর্ব ভাবনা অনুসারে এটি পড়ার পর আমরা স্থির করলাম আমাদের পঠন-পাঠন শেষে গ্রামে ফিরে যাওয়া উচিত এবং সেখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ শুরু করা উচিত। ১৯২৯ সালে আমাদের পুরো দল কমিউনিস্ট সমর্থক হয়ে গেল। সাধারণত পরীক্ষা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি কাউকে স্বীকৃতি দেয় না। এই উদ্দেশ্যেই আমরা ছাত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। একই সাথে আমরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। আমরা নির্দিষ্টভাবে সংকল্পবদ্ধ ছিলাম যে কমিউনিস্ট আন্দোলন অনুসরণ করে শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে কাজ করব।

মার্চ মাসে পরীক্ষা শেষ হবার পর আমি আমার কলেজের অধ্যক্ষকে বললাম, "এখন আমরা আমাদের গ্রামে ফিরে যাচ্ছি। পুঁথিগত শিক্ষার আর প্রয়োজন নেই, আমরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ব।" মূলতঃ ঐ সময়ে আন্দোলনে যোগ দেয়া নয়, আসলে গ্রামে ফিরে গিয়ে কৃষি শ্রমিকদের সাথে কাজ করা এবং আন্দোলনকে বিকশিত করাই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আমাদের দলটি ছিল বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন ছাত্রদের নিয়ে। সেই সময়ে পশ্চিম এবং পূর্ব গোদাবরীর ছাত্রদের নিয়ে পশ্চিম গোদাবরীতেই 'সোদরা সমিতি গ্রুপ' গঠিত হয়েছিল। কট্টর গান্ধীবাদী তেলা পি নরসিমা রাও এবং প্রকাশ রাইয়ের অধীনে ছিল এই গ্রুপটি। পশ্চিম গোদাবরীর ছাগলুতে তাঁদের একটা আশ্রম ছিল। তাঁরা সদলবলে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমিও ঐ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম এবং আন্দোলনে যাবার আগে আমি আমার গ্রামে হরিজন থেকে শুরু করে উচ্চবর্ণের লোকদের নিয়ে

সাধারণ প্রীতিভোজের আয়োজন করেছিলাম। আমি তাদের বললাম আমি জমিদার পরিবারে থেকে এসেছি, তাই আমার আত্মীয় পরিজনসহ অন্যান্যরা এই প্রীতি ভোজে কৃষি শ্রমিকদের আসতে বারণ করেছিল। তখন আমি ওদের সমালোচনা করি এবং প্রতিবাদ হিসেবে দুদিনের অনশন ধর্মঘট পালন করি। এটা ছিল তখনকার দিনের প্রতিবাদ জানানোর গান্ধীবাদী পদ্ধতি। কিন্তু এই ঘটনা সেদিন সামাজিক নিপীড়নের গভীরতাকে তুলে ধরেছে। ঐ সময়ে আমি শ্রমিকদের আরও মজুরি বাড়িয়ে ছয় সের করার দাবি জানাই। বলা হলো, 'কিভাবে তা দেবো? আমরা তো দেউলিয়া হয়ে যাবো।' আমরা হিসেব করে দেখিয়ে দিলাম, তোমরা সারা দিনে কোনো কাজ করছ না; অথচ তাঁরা (শ্রমিকরা) দিনভর কাজ করে বারো সের উৎপাদন করছে। আর সেখান থেকে কেবল ছয় সের দাবি করা হচ্ছে। নিয়মানুযায়ী আমাদের আরও বেশি দাবি করা উচিত, কেননা তোমরা তো কোনো কাজই করছ না। যাই হোক, এই আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার আগে আমরা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম....। আমাকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর একজন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিন-চার মাস পর আমাকে গ্রেপ্তার করে দু-বছরের জন্য বরস্টল জেলে পাঠানো হয়....। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমি লয়োলা কলেজে অথবা স্কোয়াড কমান্ডার হিসাবে বা সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসাবে অথবা কারাগারে যেখানেই থাকি না কেন— আমার প্রচেষ্টা ছিল যতখানি আমি বুঝি তার মধ্য দিয়ে সত্যাগ্রহীদের কমিউনিস্ট মতাদর্শের কাছাকাছি নিয়ে আসা।

১৯৩০ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলন এবং তার সীমাবদ্ধতা

প্রধানতঃ ১৯৩০-র প্রথমদিকে সরকার যখন পুনর্বাসন কর্মসূচী রূপায়ণ করছিল সেই সময়ে গ্রাম-শহরের শিক্ষিত মাঝারি কৃষকদের নিয়ে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। ফলে এই সব জেলায় আক্রান্ত মাঝারি কৃষকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার উন্মেষ ঘটে এবং শহরের শিক্ষিত

অংশের লোকেরা রাজনৈতিকভাবে জেগে ওঠে। কিন্তু এই আন্দোলনের প্রভাব গ্রামের কৃষিশ্রমিক দরিদ্র চাষী এমনকি শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে পড়েনি। অবশ্য তখন কিছু কিছু রাজনৈতিক কর্মসূচীতে শ্রমিকরা মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করত। তবে আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি মেহনতি জনগণ এই আন্দোলনে শামিল হয়নি। তাদের মধ্যে এক ধরনের নিরপেক্ষতার ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। যেহেতু প্রধান রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তাই সমস্ত গ্রাম এই আন্দোলনের অনুসারী ছিল। আমি নির্দিষ্টভাবে স্মরণ করতে পারি যে সেই সময়ে অন্ধ্র এলাকার কৃষিশ্রমিকদের একটা বড় অংশ ঐ আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। সমাজবাদী এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের সীমাবদ্ধ প্রভাবের কারণে অন্ধ্রপ্রদেশে গান্ধীবাদের প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

গান্ধীজি, তাঁর প্রভাব ও তাঁর সমালোচনা

আমাকে গান্ধীজির জীবনের যে বিষয়গুলি সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে সেগুলি হলো তাঁর আত্মজীবনী, অনাড়ম্বর সরল জীবন এবং নিম্নবর্ণের হরিজনদের পক্ষে তাঁর সওয়াল এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সাহসী প্রতিবাদ। এই কারণেই আমি সবসময় আমার জীবনকেও সরল-সহজ পথে চালিত করার চেষ্টা করি। কমিউনিজমের অর্থ হলো সকলের উন্নত জীবন যাপন নিশ্চিতকরণ, কিন্তু এটার অর্থ এই নয় যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে সাদাসিদে জীবনযাপন করতে পারবে না। কমিউনিজম সম্পর্কে এরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। আমি লেনিনবাদ সম্পর্কে বিস্তর পড়াশুনা করেছি। কমিউনিজম কি আমি তা জানি। গান্ধীজির দর্শন ব্যতিরেকে তাঁর সরল জীবন-যাপন, সৎ রাজনীতি এবং সত্যের পক্ষে দৃঢ়তা আমাকে সুনির্দিষ্টভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রথম দিকে অহিংসা আমাকে প্রভাবিত করেছিল কিন্তু যখন আমরা এর গভীরে প্রবেশ করেছি তখন এর অসারতা ধরা পড়েছে।

আপনি যখন আদর্শবাদী হয়ে ত্যাগ স্বীকার করে সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হবেন তখন শোষিত এবং শোষকের মধ্যেকার সংঘাত লক্ষ্য

করবেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব যখন শোষিতদের পাশ কাটিয়ে শোষকদের স্বার্থ সুরক্ষায় ব্যস্ত হয় তখনই গান্ধীজির দর্শনের গুরুত্ব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই সেদিন পূর্ণ স্বাধীনতার ডাকে তরুণ সমাজ বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। আমি গান্ধীজির সাথে না গিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষ কেন নিয়েছিলাম তার সম্পূর্ণ আলোচনা এখানে করতে পারব না। সম্ভবত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের দুনিয়াজোড়া নৃশংসতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাবলী সংবাদপত্রে পাঠের প্রভাবেই আমার এই মানসিকতা জন্মেছিল। গান্ধীজি যখন কোন কোন বিষয়ে কঠোর হয়েছিলেন তখনও তাঁকে পুরোপুরিভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেতে দেখিনি। আপনি গান্ধীজিকে প্রত্যাখ্যান করুন বা না করুন যাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ করছে তাঁদের প্রতি আপনার সহানুভূতি থাকবেই। আর ঐ জায়গাটাতেই নেহরুর অবস্থান। আমি অবশ্যই বলব না গান্ধীজির মতই নেহরুও আমাকে প্রভাবিত করেছেন। কিন্তু নেহরু পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন।

শ্রেণি সংগঠন ও জাতপাত বিরোধী আন্দোলন শুরুর দিনগুলো প্রসঙ্গে (১৯৩১-৩৪)

চাষীদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজকর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাঝারি ও ধনী চাষীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ভূস্বামীদের একটি ছোট অংশকেও বেছে নেয়া হয়েছিল। তবে কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন করতে যতটা মনোযোগ ও ঐকান্তিকতার প্রয়োজন ছিল, সেক্ষেত্রে ততটা ছিল না। কৃষি- শ্রমিক অপেক্ষা চাষীদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজকর্ম করা অনেক সহজতর ছিল কারণ রায়তওয়াড়ি এলাকাধীন চাষীদের সমস্যাগুলি সমাধানের দায়িত্ব ছিল সরকারের। ফসলের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া, উপযুক্ত পরিমাণে সারের যোগান ও ঋণের ক্ষেত্রে যথাযথ ছাড় পাওয়া ইত্যাদি ছিল সরকারের দায়িত্বে। এই বিষয়গুলি স্বভাবতই সরকার বিরোধী আন্দোলন করার ক্ষেত্রে উপযুক্ত । কিন্তু তবুও কোন সংঘাত হয়নি। পাশাপাশি আমরা আমাদের সাংগঠনিক কাজকর্মের ক্ষেত্র হিসেবে রায়তওয়াড়ি এলাকার প্রজাচাষীদের সমস্যাবলীকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। অন্ধ্রের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা এবং উপকূলবর্তী জেলাসমূহ

যেগুলো ছিল বড় বড় জমিদারদের অধীনে সেখানেই ছিল আমাদের সাংগঠনিক কাজকর্মের ক্ষেত্র। রায়তওয়াড়ি এলাকার প্রজাচাষীদেরও সর্বেপল্লীর রাজার মতো জমিদারদের তখন খাজনা দিতে হতো। এরকম আরো অনেক জমিদাররা খাজনা আদায় করত। আমরা তাদের এভাবে অবৈধ উপায়ে খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি। এভাবেই গ্রামীণ এলাকায় কৃষি-শ্রমিক ও চাষীদের মধ্যে সবচেয়ে সংগঠিত এবং একমাত্র শক্তি হিসেবে আমরা নিজেদেরকে গড়ে তুলেছি। এর আগে রঙ্গা ও অন্যান্যদের নেতৃত্বে চাষীদের আন্দোলন অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর এবং নোরী- বন্দোবস্তও সাধারণ সমস্যাকেন্দ্রিক ছিল। রঙ্গার প্রভাব মূলতঃ ধনী চাষী, ভূস্বামী এবং প্রভাবশালী অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আমরা কৃষি - শ্রমিক ও চাষীদের মধ্যে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলি। কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে এবং গ্রামীণ এলাকায় চাষী ও শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে কাজকর্মের পাশাপাশি যুবকদের মধ্যে সংগঠন গড়ার কাজও হাতে নিয়েছি। কারণ, আমাদের পার্টি তখন বেআইনি থাকায় অনেক যুবক সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। এই কারণেই প্রায় সব জেলাতেই যুব লীগ গঠন করা হয়। আমাদেরও তখন প্রাদেশিক যুব লীগ ছিল। যদিও এটাকে আমরা কমিউনিস্ট ফ্রন্ট আখ্যা দিইনি, কিন্তু এর মূল অভিমুখ আমাদের পরিচালনাধীন ছিল। রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলন ছাড়াও আমরা সাংস্কৃতিক কাজকর্মও শুরু করেছিলাম। গড়ে তোলা হয়েছিল পাঠাগার। যুবকরা বিভিন্ন খেলাধূলা ও সামাজিক সেবামূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণ করত।

আমার গ্রামের কৃষিশ্রমিকদের অন্যতম যে সমস্যাটি ছিল তা হল মজুরির প্রশ্ন। মালিকরা বর্ণের ভিত্তিতে শ্রমিকদের বিভিন্ন হারে মজুরি দিত। কিছু বর্ণ শ্রমিক মালিকদের বাড়িতে কাজ করলেও হরিজনদের কোন গৃহস্থালির কাজ দেয়া হত না। তাদের খুব কম মজুরি দেয়া হত, মাত্র দুই সের ধান মজুরি হিসেবে দেয়া হত। আমরা দাবি করেছি কমপক্ষে ছয় সের দিতে হবে। কিন্তু ভূস্বামীরা এর বিরোধিতা করল। আমরা তখন চাষের প্রকৃত খরচ কত হতে পারে সেটা হিসেব করে দেখলাম। দেখা গেছে, একজন

কৃষিশ্রমিক গড়পড়তা বার সের ধান উৎপাদন করে। এই বিষয়টি কৃষি শ্রমিকদের ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করল। আমরা ১৯৩৮ সালে কৃষিশ্রমিকদের একটি সংগঠন গড়ে তুললাম। প্রতিটি পরিবার বছরে একদিনের মজুরি—এই সংগঠনে চাঁদা হিসেবে দিত। ভূস্বামীরা এই সংগঠনের সার্বিক বিরোধিতা করতে লাগল এবং কৃষি-শ্রমিকরা যাতে এই সংগঠনে সামিল হয়ে তাদের অধিকারের সপক্ষে দৃঢ়মত পোষণ করতে না পারে তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে শুরু করল। এসব সত্ত্বেও কোন কোন সময় স্বল্প পরিসরে ধর্মঘটও সংগঠিত হয়েছিল।

সে সময় আমরা সর্বসাধারণের জন্য কুয়া ব্যবহারের অধিকার নিয়েও আন্দোলন করেছিলাম। সারা গ্রামে মোটামুটি ভাল পানীয় জলের কুয়া মাত্র একটি ছিল এবং সেটি থেকে শুধুমাত্র বিভিন্ন উচ্চবর্ণের লোকেরা জল নিতে পারতো, অস্পৃশ্যদের সেখানে কোনো অধিকার ছিল না। হরিজনদের মধ্যে 'মালা' এবং 'মাডিগা' নামে দু'ধরনের সম্প্রদায় ছিল। তাদের নিজস্ব আলাদা আলাদা সরকারি কুয়া ছিল। আমি দৃঢ়ভাবে দাবি তুলেছিলাম যাতে সরকারি কুয়ার জল সবাই ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে যে সমস্যা ছিল তা হল শ্রমিকদের সচেতনতা কিংবা তাদের সংগঠন কোনটাই ততটা শক্তিশালী ছিল না। ফলে কৃষি শ্রমিকদের হুমকি দেয়া হতো যদি তারা কুয়া থেকে জল নেয় তাহলে তাদের মেরে ফেলা হবে। তখন আমি নিজে সরকারি কুয়া এবং কৃষি শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত কুয়া উভয় কুয়া থেকে জল নেয়া শুরু করলাম। গ্রামবাসীরা আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করল, 'কেন তুমি এটা করছ?' আমি বললাম, "তোমরা বলছ হরিজনদের কোন অধিকার নেই। আমি বলছি আমারও তাহলে জল নেয়ার কোন অধিকার নেই। কিন্তু আমি চাই সরকারি কুয়া থেকে যাতে শেষপর্যন্ত সবাই জল নেয়ার অধিকার অর্জন করতে পারে এবং হরিজন শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে কোনও পার্থক্য না থাকে।" তখন গ্রামবাসীরা সরকারি কুয়া ব্যবহার বর্জন করল। উল্টো আমাকে জিগ্যেস করল, "তুমি কি মালা ও মাডিগাদের জন্য নির্ধারিত কুয়া থেকে জল নিতে

পারবে?" আমি জানতাম গ্রামবাসীরা এ প্রশ্নটা তুলবে। তখন আমি দু'ধরনের কুয়া থেকে জল নিলাম এবং উচ্চবর্ণের ও নিম্নবর্ণের যুবকদের একসঙ্গে নিয়ে খাওয়া দাওয়া করলাম।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিলো কিছু যুবককে সঙ্গে নিয়ে আমি একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র চালিয়েছি। এই কেন্দ্র থেকে চিকিৎসার প্রাথমিক সাহায্য দেয়ার পাশাপাশি কিছু ওষুধ দেয়া হতো। পরে জ্বরের মিক্সচারও দেয়া হতো। ছোটখাট ক্ষতের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে চিকিৎসা করাটাও আমরা আয়ত্ত করেছিলাম। এভাবে আমরা দিনে প্রায় ৫০ থেকে ১০০ জন লোকের প্রাথমিক চিকিৎসা করতাম।

একই সময়ে কৃষি শ্রমিকদের সঙ্গে বিভিন্ন কৃষিকাজে নিজে অংশগ্রহণ করে কায়িক শ্রম যে কতটা কষ্টসাধ্য তা জানার ও বোঝার চেষ্টা করেছি। এই কাজটা নিঃসন্দেহে খুব ভালো ছিলো। এর মাধ্যমে কৃষি শ্রমিকদের জীবনধারার সঙ্গে নিজেদের জীবনধারাকে মেলানো সম্ভব হয়েছে। আমরা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটাও দেখলাম যে জাতপাতের ভেদাভেদজনিত সমস্যার পাশাপাশি যদি গ্রামের গরিব মানুষ, সমাজের পিছিয়েপড়া অংশের মানুষ যেমন তাঁত শ্রমিক এবং অন্যান্য অংশের শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন সংগঠিত করতে না পারি তাহলে আমরা ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারব না। কিন্তু যেহেতু আমি এবং আমার সহকর্মীরা সমাজের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও শক্তিশালী রেড্ডি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলাম তাই তারা আমাদের কাজকর্মে বাধা না দিলেও আন্দোলনে কিন্তু অংশগ্রহণ করেনি। পরবর্তী সময়ে আমরা এটা সংশোধন করেছিলাম।

অনুরূপভাবে, আমরা গ্রামের দাসশ্রমিকদের প্রশ্নে এবং গ্রাম্য ঋণের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেছি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষিশ্রমিকরা যদি কোন কারণে একদিন কাজে যেতে না পারত তাহলে একদিনের কাজের পারিশ্রমিক কাটা হতো। চুক্তি অনুসারে যতদিন কাজ করতো তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ পাওনা বছরের শেষে দেয়া হতো। ফলে অনুপস্থিতির জন্য পারিশ্রমিক কাটা যাওয়ার পর কৃষিশ্রমিকদের যতটুকু পাওনা থাকতো তা

খুবই সামান্য পরিমাণ ছিল। আমরা বললাম "তোমরা যেখানে কৃষিশ্রমিকদের প্রাপ্য অর্থকে গ্যারান্টি হিসেবে বছরের শেষদিন পর্যন্ত রেখে দিচ্ছ তাহলে সেখান থেকে আবার কেটে রাখছ কেন? বছরে ৩০ দিন না পারলে অন্ততঃ ১৫ দিনের অর্জিত ছুটি তাদেরকে দাও। ছুটিও দেবে না উল্টো তাদের বেতন কেটে রাখবে—এটা কেন হবে?"

অন্য যে বিষয়টি ছিল তাহলো টাকা ধার নেওয়া। শ্রমিকদের উপার্জনের টাকা ভূস্বামীদের কাছে জমা থাকত। এর থেকে যদি ধার নিত, বছরের শেষে সুদ দিতে হতো মোট ধারের অর্ধেকের মত। আর যদি টাকার বদলে দানাশস্যে সুদ দিতে হত, তাহলে তার পরিমাণ আরও অনেক বেশি হত। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের মত মন্দার সময়ে ধার নিতে হতো স্থানীয় মাপানুসারে। ফসল আসার পর শ্রমিকদের প্রাপ্য টাকা দেয়ার সময় মালিকরা সুদ হিসেবে ধারের অর্ধেকের চেয়েও বেশি কেটে রেখে দিত। ভূস্বামী যদি একটু উদার হতেন, তাহলে সুদ হিসেবে ধারের চার ভাগের এক ভাগ কেটে রাখত। অন্যেরা অর্ধেক বা ধারের সমপরিমাণে সুদ কেটে নিত। সুদ নেয়ার এই পদ্ধতিটাকে আমরা তেলেগু ভাষায় বলতাম 'নামুনাবু' পদ্ধতি। আমাদের আন্দোলনের ফলে সুদের পরিমাণ কিছুটা কমলেও সুদ নেয়ার ধারাটি চালু রয়ে গেছিল। এছাড়া 'তালিয়ানাদিস' গোষ্ঠির হরিজনদের কাছ থেকে সুদ নেয়া হতো পুরনো সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে যেখানে শ্রমিকরা ধার শোধ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো ভূস্বামীর কাছে কাজের জন্য যাওয়ার স্বাধীনতা পেত না। আর যদিওবা অন্য কোন ভূস্বামীর কাছে যেতো, তাহলে নতুন মালিককে এই ধার শোধ করতে হত এবং সম্পূর্ণ ধার শোধ না হওয়া পর্যন্ত ঐ শ্রমিককে নতুন মালিক কাজে লাগাতে পারত না। তবে যেখানেই অর্থের পরিবর্তে দ্রব্যে মজুরি দেয়ার পদ্ধতির প্রচলন ছিল সেখানেই মালিকরা মাপের ক্ষেত্রে কারচুপি করে শ্রমিকদের ঠকাত। মজুরি নিয়ে শ্রমিকরা যে ঠকছে,এটা আমরা কৃষিশ্রমিকদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি। এছাড়া তখন পণ্য বিনিময় প্রথাও (অর্থাৎ জিনিস দিয়ে জিনিস দেয়া নেয়া) চালু ছিল। গরিব মানুষরা যখন একটি জিনিস দিয়ে আরেকটা জিনিস কিনতে যেত

তখন মালিকরা মাপে বিভিন্ন ধরনের কারচুপির মাধ্যমে হরিজন শ্রমিকদের ঠকিয়ে দিত— শ্রমিকদের কাছ থেকে বেশি পরিমাণে জিনিস নিয়ে তাদেরকে দিত কম পরিমাণে। এ ধরনের অনেক ছোটখাট বেআইনি কাজ তখন চলত যেগুলির বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করেছি। ....শহর এলাকায় 'শ্রমিক সুরক্ষা লীগ',রাইস মিল শ্রমিক, বাদাম তেল ও অন্যান্য তেলের মিলের শ্রমিক, ঠেলা গাড়ির চালক, মাথায় ভারি বোঝা বহনকারী শ্রমিক ও অন্যান্য অংশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে কাজ করত। তখন অন্ধ্রপ্রদেশে বড় কোনো কারখানা ছিল না। ...কৃষিশ্রমিকদের মধ্যে এ ধরনের কিছু আন্দোলন ও সংগ্রাম অন্ধ্রের গ্রামে গ্রামে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। এভাবেই শুরু হয়েছিল কৃষিশ্রমিকদের মধ্যে আমাদের কাজকর্ম।